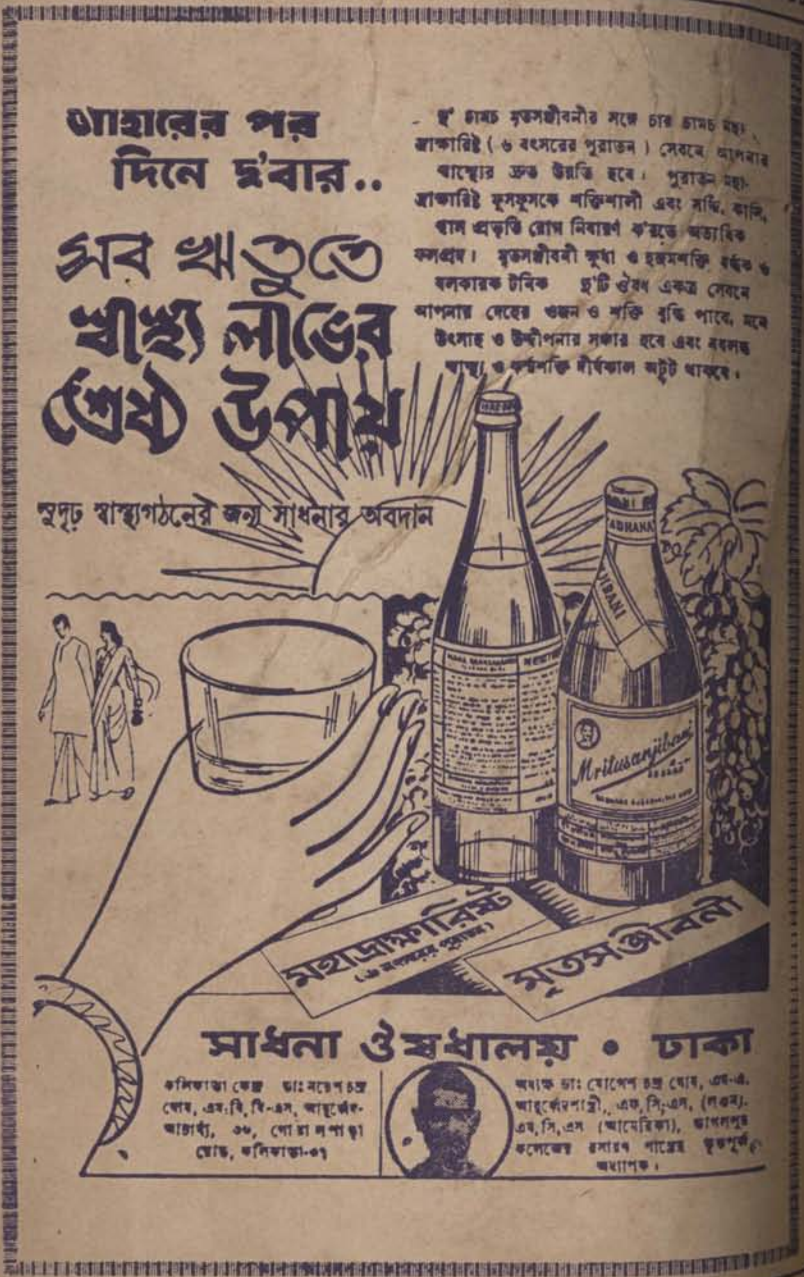
PARICHAYA :: DECEMBER 1960 :: Regd. No. C 3953



দাম : পঁচাত্তর নয়া পয়সা

পরিচয়





এখন দেখান হচ্ছে
সাইটি • জনতা • বসুশ্রী • বীণাতে
ও ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন চিত্রগৃহে
ঘুঙ্ঘট
একটী জেমিনী চিত্র
প্রযোজক ও পরিচালক
রামানন্দ সাগর
সঙ্গীত:
রবি
গীতিকার
শাকিল
বাদায়ুনী
রুপালী পর্দায় এমন জমাট কাহিনী আর আসেনি


আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাশি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
Mritusanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম,বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।


অব্যাহত গতি
একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।
আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়।
ROYAL-BLUE
FOUNTAIN
Sulekha
(GENERAL)
SOL' 5-50'
সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

পরিচয়

১৩৬৭ ; ১৮৮২

সূচীপত্র

পৌষ সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

আফ্রিকার হৃদয়ে একটি প্রভাত

প্যাট্রিস লুমুম্বা

[কঙ্গোর বীর প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা বেলজিয়ান পদলেহী মোবটু গুণ্ডাদলের হাতে বন্দী। সারা দুনিয়া জুড়ে তার বিরুদ্ধে যে বজ্রকণ্ঠ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, 'পরিচয়' আপন কণ্ঠ তার সঙ্গে মিলিয়ে গৌরব বোধ করছে। লুমুম্বার কণ্ঠ রুদ্ধ—কিন্তু রুদ্ধ নয় স্বাধীনতাকামী মানুষের কণ্ঠস্বর। লুমুম্বার কবিতায় সেই কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত।]

হাজার বছর ধরে পশুর মতো উৎপীড়িত তুমি, নিগ্রো,
দিগ্বিদিকে ছড়ানো তোমার ছাই নিয়ে ফেরে
মরুভূমির হাওয়া।

তোমার অত্যাচারীর দল গড়েছে ঝকমকে, যাদুমন্দির
তোমার আত্মার রক্ষায়, তোমার নির্যাতন সুরক্ষায়।
মুষ্ট্যাঘাতের বর্বর স্বাধীকারে, আর সাদা অধিকারের কশায়
তোমার অধিকার ছিল মরণের, চোখের জলের।

তোমার কুলদেবতার অঙ্গে ওরা অনন্ত ক্ষুধা খোদাই করল অনন্ত বন্ধনে,
আর অরণ্যের ঘোমটার নিচে বীভৎস নিষ্ঠুর মৃত্যু তোমাকে দেখছিল
সাপের মতো গাছের কোটর আর চূড়া হতে বুকে হেঁটে এল,
জড়িয়ে ধরল আলিঙ্গনে তোমার অঙ্গ আর নিপীড়িত আত্মা।

তোমার বুকের উপরে তারা রাখল, তারপর
বিশ্বাসভঙ্গের এক বিশাল বিষাক্ত অজগর :
তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিল তরল আগুনের জোয়াল,
তারা মধুর বধূকে তোমার নিয়ে গেল খেলো মুক্তার ঝিকিমিকি দিয়ে,
নিয়ে গেল তোমার অবিশ্বাস্য, মানুষের মাপজোকের বাইরের
অতুল ঐশ্বর্য।

তোমার পর্ণকুটির হতে, ডিমি-ডিমি ডঙ্কার রোল মধ্যরাত্রির গহনে ধ্বনিত হত
বিশাল, তমস্বিনী কালো নদীবাহিনীর উজানে
বহে নিয়ে তোমার অরুন্তুদ বেদনা ও শোক
ধর্ষিতা নারীর, অশ্রু প্রবাহের আর শোণিতের,
বহে নিয়ে সেই জাহাজের কথা, যারা পাল তুলে দিত সেই দেশের দিকে
যেখানে ক্ষুদে মানুষ গড়াগড়ি দেয় উইয়ের ঢিবিতে
যেখানে ডলার এখন রাজা—সেই অভিশপ্ত দেশ,
যে দেশকে তারা বলত মাতৃভূমি।

সেখানে, সেই দেশে তোমার শিশু, তোমার বধূ
দিনরাত্রি চূর্ণ চূর্ণ হত, বীভৎস, দয়ামায়াহীন
যন্ত্রের পেষণে, ভয়ঙ্কর বেদনায়, নিষ্পিষ্ট হয়ে।

তুমিও মানুষ, অন্য মানুষের মতো। তোমার বিশ্বাসের জন্য তারা বলেছে
দয়াময় সাদা দেবতা মিলিয়ে দেন, সব মানুষকে অবশেষে
মিলিয়ে দেবেন।
অগ্নিস্থলি ঘিরে তুমি বিলাপ করেছ, আর যেন গেয়েছ
অপরিচিতের দুয়ারে ঘরহারা ভিখারীর আর্তকণ্ঠ গান।

আর মত্ততা যখন ভর করেছে, আর রক্ত টগবগ ফুটেছে
সারারাত তুমি নেচেছ, গুড়িয়েছ
ঝড়ের চণ্ড ক্রোধের মতো দৃপ্ত গীতির সুরের স্বণনে,
হাজার বছরের লাঞ্ছনা হতে শক্তি ফেটে পড়েছে
জ্যাজ-এর ধাতব স্বরে, অনবগুণ্ঠিত হুঙ্কারে
মহাদেশের বুকে প্রবাহিত বিশাল তরঙ্গভঙ্গের নির্ঘোষে।

সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে বিমূঢ়, ভীতিবিহ্বল হয়ে জাগল
রক্তের সেই ভয়াল ছন্দে, জ্যাজ-এর ঐ ভয়ঙ্কর ছন্দে,
সাদা মানুষ ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে শুনল সেই নতুন সঙ্গীত
যে সঙ্গীত নিবিড় রাত্রির তিমিরে রক্তমশাল বহে নিয়ে যায়।

এই তো উষা জাগল, ভাই আমার, উষা! ছাখো
আমাদের মুখের দিকে তাকাও,
নতুন প্রভাত আমাদের প্রাচীন আফ্রিকায় ফেটে পড়ছে।
এখন হতে এই মাটি, জল, সুবিশাল নদী আমাদেরই হবে।
হাজার বছর ধরে ভাগ্যহত নিগ্রো যার অধিকারে বঞ্চিত হয়েছে।

আর সূর্যের শক্ত মশালগুলি আমাদের আলো দেবে আবার,
শুকিয়ে নেবে তোমার চোখের জল, আর মুখের নিষ্ঠিবন।
যে মুহূর্তে ছিঁড়ে ফেলবে শিকল, ঐ পায়ের গুরুভার বেড়ি,
এই নির্মম দুঃসময় কেটে যাবে চিরকালের জন্য।

স্বাধীন আর বলিষ্ঠ এক কঙ্গো কালোমাটি হতে জেগে উঠবে,
উঠে দাঁড়াবে স্বাধীন আর বলিষ্ঠ এক কঙ্গো—
কালো বীজের কালো পুষ্পিত স্তবক!

অনুবাদ / তরুণ সান্যাল

পরিচয়

৩০ বর্ষ; ৬ষ্ঠ সংখ্যা
পৌষ, ১৮৮২; ১৩৬৭

শান্তি, প্রগতি ও গণতন্ত্রের পথে

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

"নিউক্লীয়—ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধের বিপদ দূর করার জন্য, সাধারণ ও সার্বিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য এবং শান্তিরক্ষার জন্য সংগ্রামের চেয়ে জরুরি কর্তব্য আজ মানবজাতির নেই। এই সংগ্রামে অংশগ্রহণের চেয়ে মহত্তর কর্তব্য আর নেই।...

"যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়, যুদ্ধকে নিবারণ করা যায়, শান্তিকে রক্ষা করা ও সুদৃঢ় করা সম্ভব।"

(মস্কো সম্মেলন থেকে পৃথিবীর জনসাধারণের প্রতি আবেদন।)

যুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবী? পুঁজিবাদ বিদ্যমান থাকতে থাকতে স্থায়ী বিশ্বশান্তি কি সম্ভব? বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কি ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি ছাড়া আর কিছু হতে পারে? শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবস্থায় সমাজতন্ত্রের প্রসার এবং পৃথিবীময় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? এই সব প্রশ্নের উপর কিছুকাল ধরে জগৎজোড়া বিতর্ক চলে আসছে। সম্প্রতি মস্কোতে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতাদের যে মহাসম্মেলন হয়ে গেল, সেই সম্মেলনের বিবৃতিতে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিটিতে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধ নিয়তিনির্দিষ্ট ভাবে অবশ্যম্ভাবী নয়। পৃথিবীর এক অংশে পুঁজিবাদ বিদ্যমান থাকার অবস্থাতেও স্থায়ী বিশ্বশান্তি সম্ভব। সুতরাং বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পুঁজিবাদের ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি মাত্র, এমন মনে করা ভুল। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবস্থায় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতিযোগিতার দ্বারা পুঁজিবাদের অধিকতর অবক্ষয় ও সমাজতন্ত্রের অধিকতর বিকাশ সম্ভব। গত পনর বছরের ইতিহাস তার প্রমাণ। বিশ্বশান্তির অবস্থায় পৃথিবীময় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং ওই পথেই মানবসমাজকে এগুতে হবে। শান্তি সমাজতন্ত্রের মিত্র।

একথা খুবই সত্য যে, যুদ্ধ পুঁজিবাদের স্বভাব। পুঁজিবাদের অর্থই হল

শোষণ এবং শোষণের অর্থই হল হিংসা ও বলাৎকার। তারই চরম রূপ যুদ্ধ। নিজ প্রকৃতির বশে পুঁজিবাদ নানা ধরনের প্রতিবিপ্লবী ও অন্যায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তারই প্রতিরোধের ও প্রতিকারের জন্য মানুষের বাঁচার তাগিদেই দেখা দেয় নানা ধরনের বিপ্লবী যুদ্ধ ও ন্যায় যুদ্ধ। শ্রমজীবী মানুষদের উপর আক্রমণকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে এবং সাম্রাজ্যবিস্তারে অবতীর্ণ হয়ে পুঁজিবাদ দেশে দেশে গৃহযুদ্ধ বাধায়। ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদ ঔপনিবেশিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতিকারের জন্য দেখা দেয় জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ। সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য পুঁজিবাদ হস্তক্ষেপ যুদ্ধের ও বিশ্বযুদ্ধের আগুন জালায় এবং তারই উত্তরে দেখা দেয় সমাজতান্ত্রিক দেশের আত্মরক্ষা যুদ্ধ ও দেশে দেশে প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার গণযুদ্ধ। সুতরাং মনে হতে পারে যে, পৃথিবীতে যতদিন পুঁজিবাদ, ততদিন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

পুঁজিবাদের প্রকৃতি কি বদলেছে? না, তা একটুও বদলেছে বলে মনে হচ্ছে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হতে না হতেই পনর বছর ধরে পুঁজিবাদ অসংখ্য জায়গায় স্থানীয় সাম্রাজ্যবিস্তারের যুদ্ধে ও ঔপনিবেশিক যুদ্ধে হয় অবতীর্ণ হয়েছে, নয়ত অবতীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেছে। এই পনর বছর ধরে পুঁজিবাদ একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর জন্য অবিরত চেষ্টা করে আসছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অসংখ্য যুদ্ধের ঘাঁটিতে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। তারা এবং অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা নেটো, সেন্টো, সিয়াটো প্রভৃতি বহু যুদ্ধজোট সৃষ্টি করেছে। তার উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণাত্মক দ্বিরাষ্ট্রীয় চুক্তিতে বহু দেশকে আবদ্ধ করেছে। যে জার্মান যুদ্ধবাদ পৃথিবীকে দু দুবার বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত করেছে, তাকেই আবার প্রাক্তন হিটলারীয় সৈনাপত্যে পশ্চিম জার্মানিতে খাড়া করে তোলা হয়েছে। বন রাষ্ট্রই এখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের, নিরস্ত্রীকরণের ও উত্তেজনানিবৃত্তির প্রধান শত্রু। সমগ্র জাপানের বিরাট শান্তিকামী গণ-আন্দোলনকে ও যুদ্ধবিরোধী জনমতকে অগ্রাহ্য করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মুষ্টিমেয় জাপানী যুদ্ধবাদীদের সহযোগিতায় জাপানের উপর একটি আক্রমণাত্মক চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছে, যার উদ্দেশ্য হল সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও অন্যান্য শান্তিকামী দেশকে আক্রমণ করা।

আধুনিক কালে বিজ্ঞানের ও টেকনলজির বিরাট অভ্যুদয়ের ফলে

উৎপাদন শক্তির যে অভাবনীয় প্রসার ঘটেছে, রাষ্ট্রীয়—একচেটিয়া পুঁজিবাদের সংকীর্ণ কাঠামোর মধ্যে তার সম্যক ব্যবহার সম্ভব নয় বলে সাম্রাজ্যবাদীরা এবং বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মানবজাতির হিতকর এই সব উৎপাদনশক্তিকে মানবজাতির ধ্বংসের কাজে লাগানোর জন্য অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, রকেট অস্ত্র প্রভৃতি ভয়াল মহামারণাস্ত্র তৈরি করার ও জড়ো করার কাজে লেগে আছে আজ পনর বছর ধরে। সমগ্র পৃথিবীকে তারা এক সর্বনাশা অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য করছে। পূর্ণ কর্মসংস্থান সাধিত করার যে দম্ভে আধুনিক পুঁজিবাদ পৃথিবীর মানুষের কাণে তালা ধরিয়ে দিয়েছে, দেখা যাচ্ছে যে তার টেকনিকটা হল ঘন ঘন পুরনো অস্ত্র বাতিল করে নতুন নতুন, আরো নতুন, আরো মারাত্মক অস্ত্রসৃষ্টির কাজে বিজ্ঞানের ও টেকনলজির শক্তিকে ব্যবহার করা এবং এইভাবে তথাকথিত উৎপাদনকে বাড়িয়ে তোলা। এর চেয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনশক্তিকে যদি জলে ফেলে দিত বা মিশরের প্রাচীন রাজাদের মতো নির্দোষ পিরামিড তৈরি করার কাজে লাগাত, তাও বোধ হয় মানবজাতির পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর হত।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদ্দেশ্যে আমেরিকার ও অন্যান্য দেশের মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের চক্রান্ত আজ পৃথিবীকে এক ভয়ংকর সর্ববিধ্বংসী থার্মোনিউক্লীয় যুদ্ধের বিপদের সামনাসামনি দাঁড় করিয়েছে। পৃথিবীতে যুদ্ধের বিপদ বেড়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বিপদ যে কত বড় বিপদ, সে সম্বন্ধে সকলের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই যুদ্ধ যদি বাধে, তা হবে মানবজাতিকে ধ্বংস করার ও নির্মূল করার যুদ্ধ। সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চার বৎসরে যত বিস্ফোরক শক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল তার চেয়ে বেশী বিস্ফোরক শক্তি একটি মাত্র বড় হাইড্রোজেন বোমার মধ্যেই নিহিত। হাইড্রোজেন বোমা দেশের পর দেশকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলিকে ও সংস্কৃতিকেন্দ্রগুলিকে ধূলিসাৎ ও ভস্মসাৎ করে দেবে। তবু সাম্রাজ্যবাদীরা হাইড্রোজেন বোমা ও রকেট অস্ত্র তৈরি করার ও স্তূপীকৃত করার ষড়যন্ত্র থেকে নিবৃত্ত হচ্ছে না। একচেটিয়া পুঁজির সর্বাধিক মুনাফাকে মানবজাতির মঙ্গলের, এমন কি, মানবজাতির অস্তিত্বের অনেক উর্ধ্বে স্থাপন করার মূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা পুঁজিবাদের প্রকৃতির মধ্যে আছে। তার সাক্ষ্য তো চোখের সামনেই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

তাহলে পথ কি ? কোন্ পথে মানুষের ইতিহাস নিজেকে পরিপূর্ণ করবে ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ পুঁজিবাদের কালরাত্রির অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে চিরশান্তির আলোকে আত্মপ্রকাশ করবে ? আমরা কি পুঁজিবাদের প্রকৃতিকে বদলাতে পারব ? তা অবশ্যই পারব না। আজকাল শুনছি যে, এক লোকায়ত পুঁজিবাদ ও প্রগতিশীল পুঁজিবাদ জনকল্যাণকর রাষ্ট্র সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক উপায়ে মানবজাতির মঙ্গলের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এও শোনা যাচ্ছে যে, লোকায়ত পুঁজিবাদ নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমাজতন্ত্রের কলম বসিয়ে এমন এক অভিনব উপায়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কৌশল আবিষ্কার করেছে যে, শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা নতুন করে সমাজতন্ত্র গড়ার কোন প্রয়োজন নেই। এ সব হলে বোধ হয় খুব ভালই হত। মিছামিছি শ্রেণীসংগ্রাম করতে মানুষ নিশ্চয়ই চায় না। কিন্তু বাস্তব জগতে এই সব জিনিসের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে লোকায়ত পুঁজিবাদের বা আপনা-থেকে-গজিয়ে-ওঠা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আমরা চর্মচক্ষে দেখছি, দেখা যাচ্ছে যে, হাইড্রোজেন বোমার ও ক্ষেপণাস্ত্রের প্রতি তার অচলা ভক্তি। বুদ্ধ নয়, মারই তার দেবতা। এই লোকায়ত পুঁজিবাদকেই আমরা দেখেছি দক্ষিণ কোরিয়ায়, ভিয়েৎ নামে ও সুয়েজ খাল অঞ্চলে এবং তাকেই আজ দেখছি কিউবায়, কঙ্গোতে ও লাওসে। এই লোকায়ত পুঁজিবাদই শান্তির ও নিরস্ত্রীকরণের বৈঠকে কিছুতেই বসতে চায় না এবং বসলেও কিছুকাল কপট শান্তিবাজি করে বৈঠক ভেঙে দেওয়ার জন্য উসখুস করে। এই লোকায়ত পুঁজিবাদের কাছে যুদ্ধ রাজনীতিরই অনুসরণ অন্য উপায়ে এবং শান্তি শুধু পুনর্বার শক্তিপরীক্ষার ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ও সময় পাওয়ার কৌশল মাত্র। অর্থাৎ এই তথাভিহিত লোকায়ত পুঁজিবাদই হল আজকের দিনের রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ, যুদ্ধই যার ব্রত এবং যা মানবজাতির পরম শত্রু।

এই যখন আধুনিক রাষ্ট্রীয়—একচেটিয়া পুঁজিবাদের, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে একচেটিয়া পুঁজিবাদ শোষণ, লুণ্ঠন ও অত্যাচার সিদ্ধ করতে চায়, যার সাক্ষাৎ আমরা আমেরিকায়, ব্রিটেনে, পশ্চিম জার্মানিতে ও অন্যান্য দেশে পাচ্ছি, সেই একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রকৃতি, তখন মনে হতে পারে যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তার পক্ষে সম্ভব নয় কেন না তা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধের দ্বারা শোষিত মানুষকে চিরকাল দাবিয়ে রাখতে এবং ইতিহাসের প্রগতিশীলতাকে রুদ্ধ করতে কি শোষক শ্রেণীরা কোনদিন সক্ষম হয়েছে ? না, তা তারা হয় নি। বরং দেখা যায় যে, প্রতিবিপ্লবী, অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিপ্লবী, ন্যায় যুদ্ধই ইতিহাসকে বরাবর এগিয়ে দিয়ে এসেছে, এমন কি, আধুনিক কালেও। যে যুগে আমরা বাস করছি, তা পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের যুগ। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং তার ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বহির্গমন এই যুগের প্রথম স্তর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকেআরো অনেকগুলি দেশের বহির্গমন এবং একটি গোটা সমাজতান্ত্রিক জগতের সৃষ্টি এই যুগের দ্বিতীয় স্তর। শান্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে নিবারণ করতে পারে নি। ঠিক সেই রকম শান্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিবারণ করা যাবে না। যতদিন পৃথিবীতে পুঁজিবাদ আছে ততদিন পৃথিবীর ইতিহাস পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের নিয়মের দ্বারাই চালিত হবে। যখন সমগ্র পৃথিবীময় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই কেবল পৃথিবীর ইতিহাস সমাজতান্ত্রিক বিকাশের নিয়মের দ্বারা চালিত হবে এবং যুদ্ধহীন পৃথিবী সৃষ্ট হবে। তার পূর্বে নানা ধরনের স্থানীয় যুদ্ধ ও আর একটি বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

এই যদি হয় ইতিহাসের নিয়ম, তার সঙ্গে কলহ করলেই কি শান্তি আসবে ? তাই মনে হতে পারে যে, শান্তির জন্য যে দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণীর ও সমাজতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হয়েছে, শ্রেণীসংগ্রামকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধনের ভিতর দিয়েই তা পালন করতে হবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধই হবে পুঁজিবাদের ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে শেষ ও চরমতম শ্রেণীসংগ্রাম। নিউক্লীয় অস্ত্র যতই সাংঘাতিক হোক, তাতে ভয় পেলে চলবে না। থার্মোনিউক্লীয় যুদ্ধের বিভীষিকা সাম্রাজ্যবাদীরাই নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য দেখাচ্ছে। ইতিহাস এই শিক্ষা দেয় যে, অস্ত্র নয়, মানুষই যুদ্ধ জয় করে। নিউক্লীয় মহামারণাস্ত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও নিজেদের সজ্জিত করবে। সুতরাং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে একদিকে সমাজতন্ত্রের শক্তির দ্বারা এবং অন্যদিকে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারা পুঁজিবাদ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হবে। এটাই প্রকৃত শান্তির পথ। আজকের দিনে এখনই যুদ্ধ নিবারণের দ্বারা শান্তির কর্তব্য পালন করা সম্ভব নয়। তা করতে গিয়ে যদি শ্রেণীসংগ্রামকে বন্দীভূত করা হয়, তার দ্বারা যুদ্ধ বন্ধ হবে না ; বরং তা পুঁজিবাদের পরমায়ুকে

বাড়িয়ে পুঁজিবাদী হিংসা, অশান্তি ও যুদ্ধের দ্বারা আক্রান্ত মানবজাতির যন্ত্রণাকেই দীর্ঘায়িত করবে।

এই চিন্তাধারার মধ্যে একটা বিপ্লবী মেজাজ ও এক ধরনের বিপ্লবী মহনীয়তা হয়ত আছে। কিন্তু এই চিন্তাধারাটি মূলতঃ আগাগোড়া ভুল। পুঁজিবাদের প্রকৃতিই কি আজকের দিনে যুদ্ধ বাধানোর পক্ষে একমাত্র আবশ্যকীয় ও যথেষ্ট কারণ? তা যদি হত, তাহলে সাম্রাজ্যবাদীরা ইতিমধ্যেই পৃথিবীকে এক নতুন বিশ্বযুদ্ধের অতলস্পর্শী বিভীষিকার মধ্যে ডুবিয়ে দিত। সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক প্রকৃতি তো আর বদলায় নি। গত পনর বছর ধরে একাধিক বার সাম্রাজ্যবাদীরা নানা জায়গায় স্থানীয় যুদ্ধ বাধিয়ে পৃথিবীকে এক জাগতিক যুদ্ধের মহা সর্বনাশের কিনারা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। তবু বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে তারা সক্ষম হয় নি। ফস্টার ডালেসের বিখ্যাত কিনারাবাজি নীতির অবিরাম যুদ্ধপ্ররোচনা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে স্থানীয় যুদ্ধকে বন্ধ করা, তাকে বাড়তে না দেওয়া এবং বিশ্বযুদ্ধের মহাবিস্ফোরণ নিবারণ করা সম্ভব হয়েছে। মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী-ইসরায়েলি হস্তক্ষেপের অবসান ঘটানো এবং সীরিয়া, ইরাক ও অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক অভিযান নিবারণ করা সম্ভব হয়েছিল। কোরিয়া যুদ্ধে অ্যাটম বোমার ব্যবহার নিবারণ করা এবং কোরিয়া যুদ্ধকে বিস্তৃত করার চেষ্টাকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মার্কিন হস্তক্ষেপকে রোধ করা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা ভিয়েৎনাম যুদ্ধের মীমাংসা সম্ভব হয়েছিল। আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে আলজিরিয়ার লোক বীরের মতো বছরের পর বছর স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে যেতে পারছে। কঙ্গোর ও লাওসের জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদীদের নোংরা আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্রমেই আরো শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারছে।

আসল কথা এই যে, পৃথিবীটা আর আগের দিনের মতো নেই। এই কথাটাই আমাদের সকলকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে, তার নতুন শক্তিগুলির চরিত্রনির্ণয় ও ক্ষমতানির্ণয় করে তবেই মার্কসবাদী—লেনিনবাদী পদ্ধতিতে নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক নতুন শক্তি আবির্ভূত হয়েছে যারা সাম্রাজ্যবাদী সামরিক আক্রমণকে প্রতিহত করতে প্রস্তুত ও পূর্ণভাবে সক্ষম। যুদ্ধ বাধবে কি না বাধবে, তা আজকের দিনে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদীদের

প্রকৃতির ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে না। তা নির্ভর করছে একদিকে পৃথিবীর যুদ্ধবাদী শক্তিসমূহ ও অন্যদিকে পৃথিবীর শান্তিকামী শক্তিসমূহ. উভয়ের আপেক্ষিক শক্তিভেদের উপর। শান্তির শিবিরে আছে প্রথমতঃ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশব্যাপী সমাজতান্ত্রিক জগৎ; দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী; তৃতীয়তঃ, উপনিবেশের ও পরাধীন দেশের বিশাল জাতীয় মুক্তি আন্দোলন; চতুর্থতঃ, পুঁজিবাদী জগতের এমন অনেক নিরপেক্ষ দেশ যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধনীতির অংশীদার হতে চায় না এবং যারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সমর্থক; পঞ্চমতঃ, পৃথিবীর বহু সৎ, বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও মানবপ্রেমিক ব্যক্তি; এবং ষষ্ঠতঃ, বিশ্বশান্তি আন্দোলন, যা পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ববৃহৎ গণ-আন্দোলন। পৃথিবীর সকল শান্তিকামী শক্তির ও শান্তিকামী দেশের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের নতুন বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার চেষ্টাকে রোধ করা অবশ্যই সম্ভব।

তারপর, এটাও মনে রাখা দরকার যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে পুঁজিপতিদের এক অংশও আজ এই রকম চিন্তা করছে যে, পৃথিবীর শক্তি-বিন্যাসে যে নতুন পরিবর্তন ঘটেছে এবং মহামারণাস্ত্রের আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধের হননশক্তির যে অপরিসীম বৃদ্ধি ঘটেছে, সেই সকল কথা বিবেচনা করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া পুঁজিবাদীদের নিজেদের স্বার্থেই সমীচীন কাজ হবে না। এঙ্গেলস একথা বলেছিলেন যে, অস্ত্রের ধ্বংসকারী শক্তি বাড়তে বাড়তে একদিন যুদ্ধকে অসম্ভব করে তুলবে। লেনিনও একথা একদিন ক্রুপসকায়াকে বলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের বিভীষিকাময় রাজত্বকে চিরন্তন করার জন্য যে সব মহামারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে, তার ফলেই তাদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। ক্রমশঃই তাদের এক অংশ বেশি-বেশি করে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করেছে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মহামারণাস্ত্র ব্যবহারের ফলে তাদের নিজেদের দেশের বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলি ও সভ্যতাকেন্দ্রগুলিই চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ডিউক অফ ওয়েলিংটনের স্টাইলে একথা বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, ভদ্রমহোদয়গণ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চুপচাপ মেনেই ফেলা যাক। যুদ্ধ রাজনীতিরই অন্য উপায়ে অনুসরণ, এই বুর্জোয়া নীতিকে মহামারণাস্ত্র ক্রমেই অচল করে তুলছে।

এই সকল কথা বিবেচনা করে মস্কো বিবৃতিতে ও মস্কো আবেদনে বলা

হয়েছে যে, যদিও যুদ্ধের বিপদ পৃথিবীতে বেড়েছে এবং সে সম্বন্ধে সদাসতর্ক হওয়া প্রয়োজন, তবু যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানে জাগতিক বিকাশের যে নিয়মাবলীর সাক্ষাৎ পাই, তা কি এই কথাই বলে যে, যতদিন পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও পুঁজিবাদ বিদ্যমান, ততদিন পৃথিবীর ইতিহাস থেকে যুদ্ধকে দূর করা যাবে না এবং ততদিন জাগতিক বিকাশ পুঁজিবাদী বিকাশের নিয়মাবলীর দ্বারাই নির্ণীত হবে? একথা সত্য নয়। মার্কসবাদ—লেনিনবাদ বলে যে, সমগ্র পৃথিবী সমাজতান্ত্রিক হওয়ার পূর্বে পুঁজিবাদের ও সমাজতন্ত্রের দীর্ঘকাল-ব্যাপী সহাবস্থান অবশ্যম্ভাবী। এই সহাবস্থানের কালে, অর্থাৎ পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের সমগ্র যুগ ধরে, জাগতিক ইতিহাস পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র, এই দুই বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার দুই বিভিন্ন নিয়মাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। এই যুগে যেহেতু পুঁজিবাদ ক্রমে বেশি বেশি ক্ষয় পেতে এবং সমাজ-তন্ত্র ক্রমে বেশি বেশি বেড়ে উঠতে বাধ্য, তাই সহাবস্থানের কালে জাগতিক ইতিহাস ক্রমেই কম কম করে যুদ্ধবাদী পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের নিয়মাবলীর দ্বারা এবং ক্রমেই বেশি বেশি করে শান্তিকামী সমাজতান্ত্রিক বিকাশের নিয়মাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হবে। এখন ধরা যাক, এমন এক সময় এসেছে যখন উৎপাদনের দিক থেকে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দিক থেকে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের উপর অবিসংবাদিত ও ঐকান্তিক প্রাধান্য লাভ করেছে। তখনও কি জাগতিক ইতিহাস পুঁজিবাদী বিকাশের নিয়মাবলীর দ্বারাই চালিত হবে এবং যুদ্ধকে বাদ দিয়ে জাগতিক বিকাশ সম্ভব হবে না? একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। একথা বললে পুঁজিবাদকে সর্বশক্তিমান মনে করা হবে। তাই মস্কো বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ জয়লাভের পূর্বেই এবং পৃথিবীর এক অংশে পুঁজিবাদ বিদ্যমান থাকতে থাকতেই মানবসমাজের জীবন থেকে যুদ্ধকে বাদ দেওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনা উদিত হতে পারে।

পৃথিবীর শান্তিকামী শক্তিগুলির সমস্ত শান্তিপ্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করে যদি সাম্রাজ্যবাদীরা উন্মত্তের মতো মরিয়া হয়ে, মানবজাতিকে ধ্বংস করার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তাহলে মানবজাতি সহজে এই মহামৃত্যুকে বরণ করে নেবে না, এ বিশ্বাস নিশ্চয়ই রাখা উচিত। রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছিলেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে মানবজাতির সদ্বুদ্ধি-

প্রতিভা ও অপরাজেয় সংগ্রামী শক্তি পুঁজিবাদকে পরাভূত করতে ও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে সমর্থ হবে, এ বিশ্বাস ছেড়ে দিলে আমরা মানুষ নাম ধারণ করারই হয়ত যোগ্য হবে না। কিন্তু তাই বলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করে থাকা এবং তাকে নিবারণ করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা, সহজ বুদ্ধির দিক থেকে, সুনীতির দিক থেকে, শ্রেণীস্বার্থের দিক থেকে বা রাজনীতির দিক থেকে, কোন দিক থেকেই কখনও সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। বাড়িতে আগুন লাগলে আগুন নেভানো যাবে, এই বিশ্বাস কোন গৃহস্থ রাখেন বলে তিনি যদি আগুন যাতে না বাধে তার উপযুক্ত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অবহেলা করেন, তাঁকে আমরা কখনই সৎ গৃহস্থ বলি না। ঠিক সেই রকম যুদ্ধের আগুন বেধে গেলে তাকে নেভানো সম্ভব, এই বিশ্বাসের বশে যুদ্ধের অগ্নিকাণ্ডকে নিবারণ করার প্রচেষ্টা থেকে যদি বিরত থাকা যায়, সেটা কখনও সুনীতি বলে বিবেচিত হতে পারে না।

থার্মোনিউক্লীয় যুদ্ধের সর্বধ্বংসী শক্তি এমন একটা অতি ভয়ংকর বাস্তব সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদীরা তার বিভীষিকা দেখাচ্ছে বলেই সেই সত্যকে খাটো করে দেখাতে হবে, এই মনোভাব সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয়েছিল প্রায় এক কোটি লোক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় তিন কোটি লোক; তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে এর দশবিশগুণ লোক নিহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। যুদ্ধ শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকেই নিধন করবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেলে যুদ্ধের আগুন নেভানোর কাজ ও সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজিত করার কাজ কি ভাবে সম্পন্ন হবে? শুধুমাত্র অস্ত্রের বলে এবং শুধুমাত্র সামরিক উপায়েই কি? নিশ্চয়ই তা নয়। সে কাজটাও সম্পন্ন হবে মূলতঃ গণবিক্ষোভ, গণ-আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারা। থার্মোনিউক্লীয় যুদ্ধ জনসাধারণের শিবিরে নিধন যজ্ঞ সাধিত করে এই শিবিরেরই শক্তিক্ষয় করবে। তখন হয়ত জনসাধারণকে রক্ষা করার কাজ এবং তাঁদের সংঘবদ্ধ করার কাজ করতে বড় বেশি বিলম্ব ঘটে যাবে। যদি যুদ্ধ বাধার পর গণ-আন্দোলনের ও গণ-অভ্যুত্থানের শক্তির দ্বারা যুদ্ধের আগুন নেভানো সম্ভব হয়, তাহলে ওই একই শক্তির দ্বারা যুদ্ধকে নিবারণ করা আরো অনেক বেশি সম্ভব। যুদ্ধের অবস্থার চেয়ে শান্তির অবস্থা গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই মানবতাবোধ বা রাজনীতি, যে দিক থেকেই দেখি না কেন, সহজেই বুঝতে পারা যায় কেন মস্কো বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে

লড়াই যুদ্ধ বাধার পরে নয়, যুদ্ধ বাধার আগেই এবং যুদ্ধকে নিবারণ করার জন্যই পরিচালিত করতে হবে।

বর্তমানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই মানুষকে যুদ্ধের আগুনে পুড়িয়ে মারছে, এই কারণ দেখিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে কমিউনিস্টরা কি বলতে পারেন যে, এখন মানুষকে যুদ্ধের সর্বনাশ থেকে বাঁচানোর কোন দায়িত্ব তাঁদের নেই, ভবিষ্যতে পৃথিবীময় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরা এই দায়িত্ব পালন করবেন? এমন কথা নিশ্চয়ই তাঁরা বলতে পারেন না। শোষিত ও উৎপীড়িত মানুষের কাছে শুধুমাত্র পুঁজিবাদের মুখোস খুলে দেওয়ার দিন অনেক কাল গত হয়ে গেছে। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র। প্রায় পঁচাত্তরটি পুঁজিবাদী দেশে কমিউনিস্ট পার্টি রয়েছে। এদের অনেকেই বিরাট বিরাট জাতীয় পার্টি ও গণপার্টি। যেমন পুঁজিবাদী সমাজের অন্যান্য দুর্ভাগ্য থেকে, তেমনই থার্মোনিউক্লীয় যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে যথাসম্ভব মুক্তি পাওয়ার জন্য জনসাধারণ কমিউনিস্টদের দিকেই চেয়ে আছে। এই দায়িত্ব কমিউনিস্টদের পালন করতে হবে। এই দায়িত্ব পালন করেই কমিউনিস্টরা শ্রমিকসাধারণের সহিত ও বিশ্বমানবের সহিত এক হতে পারবেন। এটা যেমন নৈতিক দায়িত্ব, তেমনই রাজনৈতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সফল ভাবে পালন করা সম্পূর্ণ সম্ভব। এই জন্যই মস্কো বিবৃতিতে উদাত্ত স্বরে এই ডাক দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের জীবন-কালে, এখনই শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এমন কথা বললে চলবে না যে, ভবিষ্যতে সর্বত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে আমরা শান্তির দায়িত্ব পালন করব।

একথা অবশ্যই সত্য যে, সমগ্র পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই পৃথিবী থেকে যুদ্ধের সমস্ত সামাজিক ও জাতিগত কারণ সম্পূর্ণরূপে দূর হবে। কিন্তু একথা মনে করা ভুল যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পুঁজিবাদের ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামকে মন্দীভূত করে দেয় এবং আর একটি বিশ্বযুদ্ধই কেবল উভয়ের শ্রেণীসংগ্রামকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটকে এক নতুন স্তরে উপনীত করতে পারে। এটাও মনে করা ভুল যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সংগ্রামকে মন্দীভূত করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

মস্কো বিবৃতিতে দেখানো হয়েছে যে, গত পনর বছরের ঐতিহাসিক

ঘটনাবলীর ফলে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটে এক নতুন স্তর দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট এখন চরম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে চল্লিশটি প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবসানের দিন আগতপ্রায়। পুঁজিবাদের বাজার সমস্যা এবং বাজার নিয়ে বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের কাড়াকাড়ি উগ্রতর হয়েছে। পুঁজিবাদী জগতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার এখন জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের চেয়ে সামান্যই বেশি। পূর্ণ কর্মসংস্থান মাত্র কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশে সাময়িক ভাবে সাধিত হয়েছে। আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অব্যবহৃত উৎপাদনক্ষমতার ভারে টলোমলো। আমেরিকায় শ্রমিক বাহিনীর প্রায় ৮৷১০ শতাংশ সর্বদা বেকার। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমরীকরণ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্কের সহিত উৎপাদনশক্তির বিরোধকে মেটাতে পারে নি। পুঁজিবাদী সংকট এখন আরো ঘন ঘন দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে শক্তির বণ্টনে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদী জগতের মোট উৎপাদনে আমেরিকার অংশ হ্রাস পাচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্থিরতা, অনৈক্য, অরাজকতা ও সর্বপ্রকার অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের অত্যাচারের ও যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী জগতের অধিকাংশ মানুষ ক্রমেই বেশি বেশি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের সব লক্ষণ মিলিয়ে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, গত পনর বছরে পুঁজিবাদের আরো অনেক বেশি অবক্ষয় ঘটেছে। তা কি যুদ্ধের ফলে ঘটেছে? না, তা নয়। তা ঘটেছে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র, এই দুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার ফলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবস্থায়, শান্তির লড়াইয়ে জয়লাভ ঘটেছে বলে। এই ধরনের ঘটনা লেনিনের যুগে ঘটেনি এবং ঘটতে পারত না। ইতিহাসের নতুন সত্যের হিসাবনিকাশ করে লেনিনবাদকে প্রয়োগ করলে তবেই তা হবে লেনিনবাদের সার্থক সাধনা।

অন্যদিকে দেখা যায় যে, গত পনর বছরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবস্থায় সমাজতন্ত্রের বিকাশেও এক নতুন স্তর দেখা দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে পুরোদস্তর কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার কাজ সফল ভাবে এগিয়ে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্যান্য দেশেও সমাজতান্ত্রিক সমাজের বনিয়াদ ভাল ভাবে গাঁথা হয়েছে এবং তাদের অনেকে ইতিমধ্যেই উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ

গড়ে তোলার যুগে প্রবেশ করেছে। স্বেচ্ছায় কৃষকদের ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত চাষের পথ থেকে সমবায়ী চাষের পথে নিয়ে আসার কঠিন সমস্যাটি প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশই সমাধান করে এনেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিল্পায়নের বিপুল অগ্রগতির ফলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার পুঁজিবাদী দেশ-গুলির তুলনায় অনেক বেশি। অল্পকালের মধ্যেই মোট শিল্পোৎপাদনে ও ও কৃষিজ উৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক জগৎ পুঁজিবাদী জগৎকে অতিক্রম করবে। মাথাপিছু উৎপাদনের এবং জীবনধারণ মানের দিক থেকেও উন্নততম পুঁজিবাদী দেশগুলির সমকক্ষ হওয়ার এবং এই সকল দেশকে অতিক্রম করার জন্য বিপুল চেষ্টা চলেছে সমাজতান্ত্রিক জগতে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ও অর্থনৈতিক পরিচালনার পদ্ধতি সাম্প্রতিক বৎসরে অনেক উন্নতিলাভ করেছে। বিজ্ঞানের, টেকনলজির ও সংস্কৃতির যে উন্নতি ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক জগতে তা অভূতপূর্ব। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা ও পরিপক্বতা অসামান্য ভাবে বিকশিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক আইনকানুন ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে। বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা অনেক কিছু কাজ রাষ্ট্রের হাত থেকে স্থানান্তরিত করে জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত করা হচ্ছে। সমগ্র দেশের নৈতিক ও রাজ-নৈতিক ঐক্য সোভিয়েত ইউনিয়নে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও দ্রুত ওই দিকে এগিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক জগৎ প্রতিটি জাতির সমতার ও পূর্ণ সার্ব-ভৌমতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের ও সহযোগিতার সমন্বয় ঘটিয়ে এক নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পৃথিবীতে গড়ে তুলছে। সমাজতান্ত্রিক জগতে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্তর অতিক্রম করে এখন বিভিন্ন দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির সমন্বয়সাধনের উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়েছে। যে ধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগত ভুলের ফলে হাঙ্গেরীর প্রতিবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল, তা সংশোধন করা হয়েছে। পুঁজিবাদী জগতের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে জাতির ও জাতির মধ্যে ক্রম-বর্ধমান বিরোধ, শক্তিশালী জাতি কর্তৃক দুর্বলতর জাতির উৎপীড়ন, তার অর্থনৈতিক বিকাশকে রোধ করার চেষ্টা এবং উন্নত ও অনুন্নত জাতির অর্থনৈতিক বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা। সমাজতান্ত্রিক জগতে দেখা যাচ্ছে জাতির ও জাতির মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা

এবং অনুন্নত জাতিকে যত দ্রুতভাবে সম্ভব উন্নত জাতির সমান স্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা।

সুতরাং অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবস্থায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আরো অবক্ষয় ঘটছে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ঘটছে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং মানবসমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রয়াসী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলি, এরাই আজকের দিনে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রধান অন্তর্বস্তু, তার প্রধান প্রবণতা ও তার প্রধান চারিত্রিক লক্ষণ। আমাদের যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশ্ব সমাজতন্ত্রই এ যুগে সমাজবিকাশের নির্ণায়ক শক্তির আসন অধিকার করতে চলেছে। আজ সমাজতান্ত্রিক জগৎ এমন একটি আন্তর্জাতিক শক্তি যা জাগতিক বিকাশের উপর বিপুল ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করছে। শান্তির লড়াইয়ের দ্বারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবস্থা যদি আরো কিছুকাল বজায় রাখা যায় তাহলে নিকট ভবিষ্যতেই সকল পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সফলকাম সংগ্রামের ফলে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতির ফলে, সমাজতান্ত্রিক জগতের উৎপাদন পুঁজিবাদী জগতের উৎপাদনকে অতিক্রম করার ফলে এবং পুঁজিবাদের উপর সমাজতন্ত্রের অবিসংবাদিত ও ঐকান্তিক প্রাধান্যলাভের ফলে মানবসমাজের জীবন থেকে যুদ্ধকে বাদ দিয়ে চলার বাস্তব সম্ভাবনা জগতের ইতিহাসে দেখা দেবে। তখন এমন এক সময় আসবে যখন পৃথিবীর এক অংশে পুঁজিবাদ বিদ্যমান থাকলেও জাগতিক ইতিহাস সমাজতান্ত্রিক বিকাশের নিয়মাবলীর দ্বারাই নির্ণীত হবে। সময় পুঁজিবাদের সপক্ষে নয়, সমাজতন্ত্রের সপক্ষেই কাজ করছে।

অবিকল এই কারণেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী ও সমাজতন্ত্র আজ একথা বলতে পারে না যে, শান্তির ও গণতন্ত্রের পথে আধুনিক যুগের প্রধান প্রধান সমস্যাকে সমাধান করার দায়িত্ব আজ তারা নিতে পারে না, এই দায়িত্ব বহন করা হবে যখন পৃথিবীময় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুন ভাবে, অর্থাৎ শান্তি, প্রগতি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথে আমাদের যুগের প্রধান প্রধান সমস্যাকে সমাধান করার সময় আজই এসেছে। এই দায়িত্ব পালন করাই সকল দেশের কমিউনিস্টদের প্রধান কর্তব্য। শান্তির জন্য লড়াই করাই কমিউনিস্টদের সর্বপ্রধান কাজ।

একথা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শ্রেণী-

সংগ্রামকে মন্দীভূত করে দেয় এবং সমাজতন্ত্রের বিকাশকে বাধা দেয়। শান্তি সমাজতন্ত্রের মিত্রশক্তি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র, উভয়ের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের একটি বিশেষ রূপ। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, এই রূপ ধারণ করে উভয় ব্যবস্থার শ্রেণীসংগ্রাম পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে, পুঁজিবাদের আরো বিপুল অবক্ষয় ঘটাচ্ছে, সমাজতন্ত্রের আরো বিপুল প্রসার ও শক্তিমত্তা সাধিত করছে এবং সমাজতান্ত্রিক জগৎকে পৃথিবীর ইতিহাসের নির্ণায়ক শক্তির পদে অধিষ্ঠিত করতে চলেছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে শ্রেণীসংগ্রামকে আরো বিকশিত হতে সাহায্য করবে এবং ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সহায়তা করবে। প্রতিটি দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সে দেশের মানুষের নিজস্ব ব্যাপার, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আমদানি-রপ্তানির জিনিস নয়, এই হল লেনিনবাদের শিক্ষা। আজ যখন পৃথিবীতে একটি গোটা সমাজতান্ত্রিক জগৎ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন বহু পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে এবং বিরাট বিরাট পপুলার ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারলে গৃহযুদ্ধ বিনা শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার এবং জনসাধারণের হাতে উৎপাদনের উপায়গুলিকে ন্যস্ত করার এক নতুন সুযোগ শ্রমিক শ্রেণীর সামনে উপস্থিত হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী নিশ্চয়ই এই সুযোগকে ব্যবহার করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করবে। তার জন্য শ্রমিকদের ও কৃষকদের গণ-আন্দোলনকে ও শ্রেণীসংগ্রামকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাড়িয়ে তুলতে হবে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রেও অসামরিক উপায়ে জাতীয় মুক্তি সাধিত করার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। আবার যদি শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুরা ও জাতীয় শোষকেরা ও উৎপীড়কেরা অস্ত্রের পথ অবলম্বন করে, তাহলে গৃহযুদ্ধের দ্বারা এবং সামরিক উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তি সাধিত হবে। সামরিক বা অসামরিক, যে পথেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তি সম্পন্ন হোক না কেন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিদেশের সামরিক হস্তক্ষেপকে বাধা দিয়ে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ও জাতীয় মুক্তির পথকে প্রশস্ততর করবে।

মস্কো বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, এযুগে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার যে, শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইটা হবে প্রধানতঃ মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। এরাই অস্ত্রের প্রতিযোগিতার জন্য দায়ী,

এরাই প্রতিক্রিয়ার ও আক্রমণের প্রধান দুর্গ। সমাজের অধিকাংশের কাছ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য সকল পুঁজিবাদী দেশে বিরাট বিরাট পপুলার ফ্রন্ট গড়ে তোলা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ঔপনিবেশিক ও সদ্যস্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট তৈরী করা এবং স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র স্থাপন করার চেষ্টা করা, সকল পুঁজিবাদী দেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমাধিক গণতন্ত্রীকরণ করা, এই সকল কর্তব্য পালন করতে হবে। গণতন্ত্রীকরণের লড়াই অবশেষে এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশে ও জাতীয় গণতন্ত্রগুলিতে দেশের মানুষ বুঝতে পারবে যে, পার্লামেণ্টীয় পথেই হোক বা অ-পার্লামেণ্টীয় পথেই হোক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া অন্য পথ নেই।

জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে যে রাষ্ট্র রক্ষা করে, স্বৈরতান্ত্রিক ও ডিক্টেটারি শাসনপদ্ধতিকে বর্জন করে চলে, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করে, নিজেকে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধজোটের বাইরে রাখে, নিজ দেশের মাটিতে যুদ্ধঘাঁটি স্থাপন করতে দেয় না, দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটতে দেয় না, ভূমিসংস্কার সাধন করতে চায় এবং একটি রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্র গড়ে তুলে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতি ও জীবনধারণ মানের উন্নয়ন ঘটাতে চায়, এই ধরনের স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র স্থাপন করা ও রক্ষা করা আজকের দিনের ঐতিহাসিক অবস্থায় এশিয়ায় ও আফ্রিকায় খুবই সম্ভব। এই কর্তব্য পালন করে, সাম্রাজ্যবাদের ও সামন্ততন্ত্রের সহিত এই সকল রাষ্ট্রের আপোষপ্রবণতার বিরুদ্ধে সর্বদা লড়াই করে এবং এই সকল রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী প্রবণতাকে সর্বদা শক্তিশালী করে কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদের জাগতিক অবক্ষয়ে, সমাজতন্ত্রের জাগতিক প্রসারে ও নিজ নিজ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারোন্মোচনে সহায়তা করবেন।

শান্তির লড়াই শুধু আবেদন-নিবেদনের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদকে খুশি করার ও তার সঙ্গে আপোষ করার চেষ্টা, এটা মনে করা নিতান্ত ভুল। একদিন মিউনিকফেরত নেভিল চেম্বারলেন ছাতা বগলে করে ইংলণ্ডে আওয়াজ তুলেছিলেন, আমাদের জীবনকালে শান্তি। সেদিন রাজকবি মেসফীল্ড সঙ্গত ভাবেই তাঁকে ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কিন্তু আজ মস্কো থেকে আমাদের জীবনকালেই শান্তিস্থাপনের যে রব তোলা হয়েছে,

তা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষের আহ্বান নয়, তা শ্রেণীসংগ্রামকে জোরালো করারই আহ্বান, তা প্রতিপদে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে ঐক্যবদ্ধ গণশক্তির ও গণ-আন্দোলনের দ্বারা প্রতিহত করারই আহ্বান। শান্তির জন্য সর্বাগ্রে দরকার অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা, নিউক্লীয় অস্ত্রের ব্যবহার, পরীক্ষা-কার্য ও উৎপাদন নিষিদ্ধ করা, বিদেশে স্থাপিত যুদ্ধঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করা, যুদ্ধজোটগুলিকে ভেঙ্গে ফেলা, জার্মানির সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্থাপন করা, পশ্চিম বার্লিনকে একটি অসামরিক খোলা শহরে পরিণত করা, পশ্চিম জার্মানির প্রতিহিংসাপন্থীদের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধিকে চূর্ণ করা এবং জাপানী যুদ্ধবাদের পুনরুভ্যুদয়কে নিবারণ করা। সক্রিয় শান্তিনীতি অবলম্বন করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও অন্যান্য শান্তিকামী দেশগুলি, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী এবং সকল দেশের জনসাধারণ যদি আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লড়াই চালিয়ে যায়, তাহলে এই সকল লক্ষ্যকে কার্যতঃ সিদ্ধ করা এবং সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি মেনে নিতে সাম্রাজ্যবাদীদের বাধ্য করা সম্ভব হবে। প্রায়ামের মতো অ্যাকিলিসের কাছে মিনতি করার জন্য বা শ্রীকৃষ্ণের মতো শুধুমাত্র ন্যায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কুরুপক্ষের মুখোস খুলে দেওয়ার জন্য শান্তিপ্রস্তাবে প্রবৃত্ত হওয়া এযুগে অচল। সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণের কাছ থেকে মুষ্টিমেয় আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদীদের বিচ্ছিন্ন করে শান্তি প্রস্তাব মানতে তাদের বাধ্য করতে হবে, এই বিশ্বাস পোষণ করে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়ার জন্য নিরলসভাবে শান্তির জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে।

মস্কো সম্মেলনের বিবৃতি ও আবেদন প্রমাণ করে দিল যে, বিশ্ব কমিউনিজমই এ যুগের মস্তিষ্ক ও বিবেক। পৃথিবীর সকল সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছেই আজ এটা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, হিংসা, বল ও স্বৈরতন্ত্রের পরাজয় ঘটিয়ে অহিংসা, মৈত্রী, শান্তি ও গণতন্ত্রের পথে সামাজিক প্রগতি সাধিত করার ডাক এবং নতুন এক শান্তিপূর্ণ উপায়ে আজকের পৃথিবীর সমস্যার সমাধানের ডাক কমিউনিজমের শিবির থেকেই আসছে। এই ডাকে নিশ্চয়ই তাঁরা সাড়া দেবেন।

জার্মানীতে কালিদাস

ভাণ্টের্ রুবেন্

প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের নাম ইউরোপে জানা গেল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে। ঐ সময়ে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলসমূহে একটি কেন্দ্রীয় আইন, রাজস্ব ও শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত অঞ্চলগুলি তারা ১৭০০ সালের পর থেকে ভারতীয় রাজ-রাজড়া এবং পূর্ববর্তী দখলদার ফরাসীদের কাছ থেকে যুদ্ধ করে জয় করে নিয়েছিল। এই অঞ্চলগুলির পরিমাণ ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের অর্ধাংশেরও বেশী এবং উর্ধ্বতম পদগুলি সবই ছিল ইংরেজদের হাতে।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং বিদগ্ধ পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্স বাংলা দেশের সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদের ভার গ্রহণ করলেন। ফরাসী বিপ্লবের সূচনার ঠিক পূর্বমুহূর্তে, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম কালিদাস রচিত নাটক শকুন্তলার একটি ইংরেজী গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং চমৎকৃত ইউরোপকে দেখিয়ে দেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষের নিকট নাটক এবং মঞ্চাভিনয় অজ্ঞাত ছিল না। তিনি কালিদাসকে ভারতবর্ষের শেক্সপীয়র আখ্যা দিয়েছিলেন—তুলনাটা নিতান্তই অকেজো, সন্দেহ নেই।

কিন্তু ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী গণতন্ত্রবাদী, জ্যাকোবিন্‌রা যখন ফরাসী দেশের বড় অভিজাত এবং বড় জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ছড়াতে আরম্ভ করল তখন মাইন্‌ৎস্‌-এর জ্যাকোবিন্, গেঅর্গ ফর্স্টের জোন্সের ইংরেজী সংস্করণ শকুন্তলার একটি জার্মান গদ্যানুবাদ রচনা করেন। বইটির একটি খণ্ড গ্যেটেকে পাঠিয়ে দিলে, তিনি নাটকটি সম্বন্ধে এত উৎসাহিত হয়েছিলেন যে দুইটি শ্লোকে এর একটি প্রশস্তি লিখেছিলেন :

> "সদ্য ফোটা ফুল আর পরিপক্ক ফল, একটি কথায়
> পরিপূর্ণতা ও পরিতৃপ্তি, স্বর্গ-মর্ত্য যদি কেউ চায়
> একই সাথে উত্তেজনা আর মন্ত্রমুগ্ধতা,
> শকুন্তলা,—আমি শুধু বলি ; সব কিছু বলা হয়ে যায়॥

গএটে এই চরণ কয়টি 'ডয়েট্শে মোনাট্স্শ্রিফ্ট্'-এ (জার্মান মাসিক পত্রিকা) ছাপিয়ে ছিলেন ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দেই। আর তার পরের বছর তৎকালে ভাইমারের বাসিন্দা হের্ডের তাঁর "প্রাচ্য নাটক" প্রবন্ধের শীর্ষদেশে স্থান দিয়েছিলেন ঐ চরণকটিকে। তিনি আবার শকুন্তলার উল্লেখ করলেন ১৭৯৮ সালে: "যেহেতু দুর্ভাগ্যবশত এখনো পর্যন্ত শকুন্তলাই ভারতবর্ষের সুঅনুশীলিত সংস্কৃতির একমাত্র নিদর্শন সেইহেতু এইটি পাঠ করে সকলেই আনন্দ পাবেন। নিকট ভবিষ্যতে আমাদের আরো শকুন্তলা চাই। কারণ মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসে এগুলি সর্বাপেক্ষা সুচারু অবদান।"

মাত্র পাঁচ বছর পরে, ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে হের্ডের নাটকটির ফর্স্টের কৃত অনুবাদখানা আবার প্রকাশ করলেন এবং এর সঙ্গে একটি উৎসর্গপত্র যোগ করে দিলেন। এতে তিনি কালিদাসের প্রতি তাঁর ভালোলাগাকে আবার নূতন করে ব্যক্ত করলেন। লাইপ্ৎসিগের মেলায় ফ্রিড্রিশ শ্লেগেল ফর্স্টেরের প্রথম সংস্করণটির খোঁজ পেলেন সেটি বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এই উল্লেখযোগ্য রচনাটি সম্বন্ধে তিনি তাঁর ভাইকে লিখে জানান। পরে সংস্কৃত শিখতে তিনি প্যারীতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতেই জার্মানীতে ভারততত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল।

পরে গএটে লিখেছিলেন: "আমরা জার্মানরা কি-উৎসাহের সঙ্গে শকুন্তলার এই অনুবাদকে স্বাগত জানিয়েছিলাম সে-কথা স্মরণ করে, যে গন্থের মারফত এটি আমরা পেয়েছিলাম, সেই গন্থকেই তাবৎ আনন্দ-দানের জন্য দায়ী করছি।" তিনি যে খুবই সঠিক কথা বলেছিলেন তা এই সামান্য কয়টি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

জার্মান মধ্যবিত্ত সমাজে ফর্স্টেরের কাজের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

ফ্রিডরিশ্ রুয়েকের্ট নাটকটি আবার জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন ১৮৫৫ সালে। এই অনুবাদটি সরাসরি সংস্কৃত থেকে করা হয়েছিল। কিন্তু অনুবাদটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৭ সালে।

হাইনরিশ হাইনের মৃত্যুর পর ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর প্রকাশ থেকে জানা যায় যে হাইনে আলোচ্য নাটকটি সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন। "চিন্তা এবং ধারণা" শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি লিখেছিলেন, "ফাউস্টের প্রারম্ভে গএটে শকুন্তলাকে কাজে লাগিয়েছেন।" এতদ্বারা তিনি বোঝাতে চাইছেন যে ফাউস্টের "ফর্স্পিল আউফ্ ডের্

...আটের্" অর্থাৎ অভিনয়ের প্রস্তাবনার ধারণাটি গএটে শকুন্তলার নান্দী ...কেই পেয়েছেন। শকুন্তলায় একজন অভিনেতা সর্বপ্রথম মঞ্চে আবির্ভূত ... এবং শিবের নিকট প্রার্থনা জানান। কারণ ভারতীয় নাটক দিন-রাত্রির ...রেক প্রহর ব্যাপী ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। তারপর ...সেন মঞ্চনির্দেশক, আহ্বান করে আনেন প্রধান অভিনেত্রীকে এবং তাঁকে ...নিয়ে দেন যে মার্জিত রুচি দর্শকবৃন্দের সামনে কালিদাসের শকুন্তলা ...কটি অভিনীত হবে, অতএব অভিনেতারা যেন যথাসাধ্য করেন।

"ভদ্রে আমি তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি যে এই রুচিবান দর্শকবৃন্দ ...খানি আনন্দ লাভ করবেন ঠিক ততখানিই আমি আমাদের অভিনয়-...তিভার মূল্য দিয়ে থাকি। কিন্তু যতই প্রচেষ্টা করি না কেন আমি আমার ...জের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান।" এরপর মঞ্চনির্দেশক প্রধান অভিনেত্রীকে ...গত বসন্ত ঋতুর প্রশস্তিমূলক একটি গান গাইতে অনুরোধ জানান ... পালা আরম্ভ হয়।

গএটের প্রস্তাবনার ধরনটি এই রকম: পরিচালক, নাট্যকার এবং ...তুকাভিনেতাকে সঙ্গে করে মঞ্চে প্রবেশ করেন এবং তাঁদের উভয়ের ...হায্য প্রার্থনা করেন। নাট্যকার প্রথমে জনগণের সম্বন্ধে কোন কথা ...তে অস্বীকৃতি জানান এবং কেবল চিরন্তন মূল্যের কথাই চিন্তা ...ন। কৌতুকাভিনেতা চিরন্তনের কোন কথাই শুনতে রাজী নন কেবল ...াময়িকদের আনন্দবিধানই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। পরিচালক চান একটি ...র্ষণীয় পালা উপস্থিত করতে।

কৌতুকাভিনেতা নাট্যকারকে উপদেশ দেন: "জীবনের পরিপূর্ণতার ... ঝাঁপিয়ে পড়; জীবনধারণ তো করে সকলেই কিন্তু তাকে জানে ... অল্প কয়েকজন। আর যেখানেই তুমি একে ধরে ফেলতে পারবে ...ানেই জীবন হবে আকর্ষণীয়।"

"সত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা আর শঠতার মজা সম্বন্ধে বলেন নাট্যকার। ...াবে তিনজনে আর্টের গভীর সমস্যা সম্বন্ধে চাতুর্যপূর্ণ সংলাপে প্রবৃত্ত ... এর সঙ্গে কালিদাসের সাদৃশ্য নেই মোটেই। তিনি নাট্যকারের ... পালাটির নামকরণের সঙ্গে দর্শকবৃন্দকে পরিচিত করিয়ে দিতে গিয়ে ... একটি প্রস্তাবনা রচনার ভারতীয় প্রথারই অনুসরণ করেছেন মাত্র। ...নয়ের কোন ছাপানো কার্যসূচী তো ছিল না। তাছাড়া এই সুযোগে

তিনি তাঁর দর্শকদের স্তুতিবাদও করে নিয়েছেন। গএটের ভাইমারে পেশাদার নাট্যশালায় যে জনতা রাতের পর রাত ফুর্তি করতে আসত, কালিদাসের দর্শকরা মোটেই সে দলে পড়ে না। রাজার দরবারগৃহে কিংবা ক্ষুদ্রতর কোন নাট্যশালায় কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে যারা আমোদপ্রমোদের জন্য জমায়েত হত তারা ছিল, অমাত্য, ব্রাহ্মণ, উচ্চ পদাধিকারী রাজ-কর্মচারী এবং সম্ভবত মুষ্টিমেয় ধনী-শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত জনসমাজের ছোট্ট একটি গোষ্ঠী। নাটকের ভাষা সংস্কৃত জনসাধারণের ব্যাপক অংশ এমনকি বুঝতেও পারত না। কাজেই দুইটি প্রস্তাবনার মধ্যে এই যে বিরাট পার্থক্য তা নাটকাভিনয় সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই ধরনের সমাজকে সূচিত করছে। শিল্পকলার এই রত্নটির প্রতি গএটেকে অনুপ্রাণিত করবার জন্য আমাদের এই ভারতীয় কবিকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

গএটে কালিদাসের গীতিকাব্য 'মেঘদূতে'র সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন এইচ. এইচ. উইল্‌সনের ইংরেজী অনুবাদের মারফত। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে উইল্‌সন্‌ বাংলা দেশে নবপ্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮১৩ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর প্রথম কাজ মেঘদূতের মূল এবং অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এই কবিতাটিতে জনৈক যক্ষ যক্ষপুরী থেকে নির্বাসিত হয়ে স্বদেশে তার প্রিয়ার কাছে মেঘের মারফত একটি বার্তা পাঠাচ্ছে। গএটে এর উপরও একখানি চতুষ্পদী শ্লোক রচনা করেছিলেন :

"আনন্দ আরো কত কামনা মানুষের ?
নল ও শকুন্তলা—প্রিয় হৃদয়ের।
বার্তাবহ মেঘদূতে প্রিয়া সন্নিধানে,
কে না প্রেরণ করে দ্বিধাহীন প্রাণে ॥"

তাঁর "ভেস্ট্‌-এস্ট্‌লিশের ডিভান্‌, নোটেন্‌ উণ্ড্‌ আভাণ্ডলুঙ্গেন" বা 'প্রাচী প্রতীচি আসন সংবাদে' তিনি এর মালিকানা স্বীকার করেছেন : "এইরকম একটি রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় সর্বদাই আমাদের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা।" কিন্তু তিনি উইল্‌সনের অনুবাদকে অত্যন্ত মোলায়েম বলে সমালোচনা করেছিলেন। আর প্রশংসা করেছিলেন তাঁর কোন আলাপী বন্ধুকে যিনি তাঁকে মূল থেকে গোটা কয়েক শ্লোকের অনুবাদ করে দিয়েছিলেন : "এগুলি সুনিশ্চিতভাবেই একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারণার জন্ম দেয়।" ১৮২৬ সালে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফন্‌ হুম্‌বোল্ট্‌ প্রাচীন ভারতবর্ষের এই

কাব্যটিকে প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন। বর্ষারম্ভে প্রথম মেঘপুঞ্জ সমাগমের আশ্চর্য সুন্দর বর্ণনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিলেফেণ্ডে ১৮৫৯ সালে শুয়েৎস্‌ কাব্যটির প্রথম গদ্যানুবাদ প্রকাশ করবার পর আরো অনেকেই তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। কেউ কেউ পদ্যানুবাদও করেছিলেন। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের উইল্‌সন্‌ কৃত অনুবাদ এবং তার মালবিকাগ্নিমিত্রের একটি সংক্ষিপ্তসার ইউরোপে পরিচিতি লাভ করল ১৮২৭ সালে। ১৮৫৬ সালে আ. ভেবেরের উৎকৃষ্ট অনুবাদের মাধ্যমে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' সর্বপ্রথম শিক্ষিত জার্মানদের আয়ত্তের মধ্যে এল। উইল্‌সনের সময় থেকেই পণ্ডিতেরা এই নাটকটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন এবং একে অবহেলাই করে আসছিলেন। কিন্তু বার্লিনের এই প্রতিভাবান ভারততত্ত্ববিৎ নাটকটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯১৭ সালে স্বয়ং লিওন্‌ ফয়ক্টভানগের জার্মান মঞ্চের জন্য নাটকটিকে "নটী ও নৃপতি" নাম দিয়ে প্রস্তুত করলেন।

'বিক্রমোর্বশী' নাটকের একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন বোল্লেনসেন সেই ১৮৯৪ সালে। রুয়েকের্ট তাঁর ১৮৩৪ সালের সংক্ষিপ্তসারে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন মাত্র অল্প কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ। কালিদাসের মহাকাব্য 'রঘুবংশে'র যে অংশে অজ তার মৃত পত্নী ইন্দুমতীর জন্য বিলাপ করছেন রুয়েকের্ট ১৮৩৩ সালে সেই অংশটি থেকে কতকগুলি শ্লোকের অনুবাদ করেছিলেন। এই রচনাটির জার্মান অনুবাদ মুক্তছন্দে করেছিলেন আ. ফন্‌শাক্‌ ১৮৯০ সালে এবং গদ্যে করেছিলেন ও. ভাল্টের ১৯১৪ সালে। কালিদাসের ষষ্ঠতম রচনা 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্য ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন গ্রিফিথ্‌ ১৮৭৯ সালে আর জার্মান গদ্যানুবাদ করেছিলেন ও. ভাল্টের ১৯১৩ সালে।

এইভাবে কালিদাসের যে ছয়টি রচনা আজও পর্যন্ত টিঁকে আছে, তার একটির, অনুবাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের, জার্মানদের কাছে পৌছতে লেগেছিল শতাধিক বৎসর। সুবিখ্যাত ভারততত্ত্ববিৎ আ. হিল্লেব্রাট্‌ মাত্র ১৯২১ সালে ব্রেস্‌লাউতে তাঁর রচনা, 'কালিদাস, সাহিত্যিক মূল্যায়নের একটি প্রচেষ্টা' প্রকাশ করেন। তিনি কালিদাসের কাল, তাঁর রচনা ও শিল্পাকৃতি সম্বন্ধে ১৬৬ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার পর সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ক্লাসিক রচনাগুলির যে জনপ্রিয়তা রয়েছে

কালিদাস কখনো তার কাছেও এগুতে পারবেন না। হোমার অথবা আন্টিগোনের কবির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার পক্ষে কিংবা দান্তে বা শেক্সপীয়র যেমন, তেমনি করে শিক্ষিত জনচিত্তকে চিরতরে আকৃষ্ট করে রাখবার পক্ষে ভারতীয় সাহিত্য আমাদের চৈতন্যের সামীপ্য থেকে বহুদূরে অবস্থিত।... আমরা খুবই সামান্য পৌরুষ এবং খুবই সামান্য নাট্যবস্তু, খুবই অল্প দ্বন্দ্ব এবং নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সাক্ষাৎ পাই।...আমাদের প্রয়োজন আরো গভীর সমস্যার। তথাপি কালিদাসের রচনার মধ্যে খাঁটি এবং শাশ্বত কাব্যগুণের এত প্রাচুর্য যে, যে-সকল পাঠক এদের কয়েকটি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে নিরুৎসাহ হবেন না এই রচনাগুলিকে তাঁদের আয়ত্তের মধ্যে এনে দেওয়ার সার্থকতা আছে।"

আমরা হিল্লেব্রাণ্টের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাটির জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ কিন্তু তথাপি তাঁর বিচারটি মেনে নিতে অক্ষম। আজকের জার্মানী আর ১৯২১ সালের জার্মানী এক নয়। হিল্লেব্রাণ্ট তখন লিখেছিলেন এক সঙ্কীর্ণ শিক্ষিত পাঠকগোষ্ঠীর জন্য। এরা বিশ্বসাহিত্যের ঐশ্বর্যের মধ্যে সন্ধান করছিলেন যুদ্ধোত্তর জার্মানীর দুর্ভাগ্য থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একটা রাস্তা। (তাঁর বইটি লিখিত হয়েছিল ১৯১৮ সালে)। কিন্তু আজ আমাদের দেশের শ্রমজীবী জনতা মানবতাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বের সকল মহৎ সাহিত্যিকের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছে। আমাদের দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের হৃদয়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ স্পন্দন শুনতে চায়। আমরা যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করি, যেমন তাকে আমরা আমাদের বর্তমানের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা করি তেমনি আমরা অপর দেশের মানুষের অতীত এবং বর্তমান আনন্দের অংশীদারও হতে চাই। আমরা প্রাচীন ভারতের এই ক্ল্যাসিক্যাল কবির কাছ থেকে "নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ" ইত্যাদি মোটেই দাবি করব না। ভারতের মানুষের কাছে তিনি যে কতখানি ছিলেন আমরা শুধু তাই জানতে চাই। আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, তাঁর রচনা, যা এখনও টিঁকে আছে, তা থেকে আজও আমরা বহু কিছু পেতে পারি। আমরা তাঁকে তাঁর নিজস্ব পটভূমিকায় বুঝতে চেষ্টা করলে দেখব যে গএটে এবং হের্ডের যেমন বলেছিলেন তিনি সত্যি তেমনি একজন মহৎ কবি; দেখব যে তিনি সত্যি তাঁর দেশবাসীকে ভালবাসতেন এবং জানতেন কেমন করে তাদের

ব্যথা-বেদনা-আনন্দের হুবহু চিত্র আঁকতে হয় এবং আরো দেখতে পাব যে তাঁর সমসাময়িক শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতার প্রতি তাঁর একটা তীক্ষ্ণ সমালোচনা-মূলক দৃষ্টি ছিল। তাঁর ভাষা হল তাঁর শ্রোতাদের 'মনোযোগ আকর্ষণ করার অস্ত্র স্বরূপ।' অবশ্য বর্তমান অনুবাদগুলি থেকে সে সম্বন্ধে ধারণা করা খুবই দুরূহ। পাঠক এবং শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার মতোই প্রকৃত কবিসুলভ কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। এমনই মহৎ ছিল তাঁর মানবিক দিকটি এবং তিনিও এমনই উৎফুল্ল এবং আন্তরিকতাপূর্ণ, বস্তুবিশ্বকে তিনি সর্বদাই এমনভাবে প্রতিফলিত করেছেন যে তাঁর চৌহদ্দির মধ্যে পা বাড়াতে সকলেই ঔৎসুক্য অনুভব করবেন।

কালিদাসের পৃথিবী ইউরোপীয় মনের কাছে অপরিচিত নিশ্চয়ই। কিন্তু একবার বাইরের অপরিচিত পরিধিকে কাটিয়ে যেতে পারলে, আমরা ভিতরের সাধারণ মানবিক বিষয়বস্তুগুলি খুঁজে পাব সহজেই। ভারতীয়দের সঙ্গে জার্মানদের পার্থক্য আছে। সামন্ততন্ত্রের প্রথম যুগের মানুষ এবং সমাজ-তন্ত্রের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠাকারী মানুষের মধ্যে পার্থক্য অনেক। কিন্তু গায়ের রং যাই হোক না কেন মানুষ মানুষই।

আমরা যদি আমাদের নিজস্ব জার্মান কিংবা ইউরোপীয় সংস্কৃতির চৌহদ্দির মধ্যে নিজেদের আটকে রাখতাম তবে আমরা কতই না দরিদ্র থেকে যেতাম। জ্যাকোবিন ফর্স্টের ১৭৯১ সালে তাঁর ভূমিকায় লিখেছিলেন : "সকল দেশেরই এমন সব নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা তার আত্মিক শক্তি এবং জনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। যদি আমরা এই পরিবর্তমান বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনা করি এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্য থেকে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলাদা করে ফেলি তাহলে মানবসমাজ সম্বন্ধে আমরা একটি সঠিক ধারণায় পৌছতে পারব। এক্ষেত্রে (শকুন্তলার ক্ষেত্রে) আমাদের কল্পনা এবং অনুভূতির সামনে এক সম্পূর্ণ নতুন দিগন্ত, মানবচরিত্রের এক অসাধারণ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের পুরাণ, ইতিহাস, রীতিনীতির সঙ্গে, যেমন ধরা যাক গ্রীকদের যে পার্থক্য বর্তমান সেই পার্থক্য আমাদের কাছে ভারতের শিল্পকর্মকে কিভাবে আঙ্গিক এবং আকৃতিতে অস্বাভাবিক করে তোলে সেটা পরিষ্কার করে ধরে ফেলা প্রয়োজন। নাটকগুলি পাঁচ দৃশ্য বিশিষ্ট না সাত দৃশ্য বিশিষ্ট তা যে এই সম্বন্ধে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নয় এবং রাইন, তিবের, ইলিস্‌সুস্‌ নদীর তীরে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গ জাতি সমূহের মতোই গঙ্গানদীর তীরে বসবাসকারী ঘনবাদামী গাত্রবর্ণের লোকেরাও যে কেবল মাত্র মানবহৃদয়ের বোধগম্য কোমলতম অনুভূতিগুলির সূক্ষ্ম প্রকাশে পারঙ্গম, সেকথাও স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।"

অনুবাদক / অনিমেষ পাল

কবিতাগুচ্ছ

ফিরে সে আসবে জানি

মণীন্দ্র রায়

জানি সে আসবে, তাকে আসতেই হবে
যেখানে স্বভূমি তার, যেখানে জীবন।
যতদূরে যাক পাখি, ফিরে আসে আপনার নীড়ে
প্রশ্ন শুধু : কী লগ্নে ? কখন ?

যে হৃদয়ে করুণার মৌন স্রোতোধারা
প্রতিটি তৃষ্ণার ঘট ভরে ঘাটে ঘাটে,
যে মনে আকাশ-ভালোবাসা—
নিজেকে বিশীর্ণ ক'রে ছিন্ন ক'রে সংকীর্ণ সীমায়
বিলের শৈবালে শুয়ে হাঁটুজলে শালুকখেলায়
মেটে-কি সে সমুদ্র জিজ্ঞাসা !

ফিরে সে আসবে জানি, আসতেই হবে।
প্রশ্ন শুধু : কখন ? কী করে ?
ওই মুখ হাসিভরা, ওই চোখ অশ্রুতে সজল—
স্বস্তিতে না পাই, পাব ঝঞ্ঝার শিখরে ॥

আমার শিক্ষা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শূন্যতা দিয়েছ বুকে, দাওনি অভীপ্সা গুরুতর
যাতে তা ভরাতে পারি, কীর্তি দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত
করতে পারি প্রতিতুল্য ফুল গাছের ফুলের মতন।
চেতনা দিয়েছ যেন সবকিছু আপাতখণ্ডিত
বোধ হয়। সত্য, স্থায়ী শাঁস নয়, খোলসেই মেলে,
তথা প্রাকৃতিক প্রৌঢ় কানাচের দীর্ঘতাই সব ;
তারুণ্য অন্তরমাঝে সমর্থ, গঠিত কিংবা দড়,
আমরা মানব না চেত, : সন্দেহপ্রবণ চিরকেলে।

এই তো আদতে ফাঁক চেতনা ও চরিত্রের মাঝে।
এই তো মৌলিক বাষ্পরুদ্ধ গলা প্রাণদয়িতার ;
ও-যে মুখে রেখে শাঁখ পরিস্ফুট করতে চায় ধ্বনি,
মঙ্গলপল্লবসম তুলে ক'রে অরণ্য সংহার।
যদি পারি ওরই কাছে ব্যবধান মেলাতে শিক্ষা নি ;
ওর পায়ে ধরে যাচি, শান্তি দাও, মেধায় ও কাজে।

অরণ্যপথে

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

এইমাত্র এ অরণ্যে ক্রন্দনের বৃষ্টি ঝরে গেছে
শিয়রে আচ্ছন্ন রাত্রি ; মৃত-জ্যোৎস্না, নক্ষত্রের বুকে
সুন্দর আসক্তি আঁকা ; সিক্ত দেহে যৌবন এসেছে
সর্বনাশা ; অথচ সুদীর্ঘ পথ তৃষ্ণাতুর আমার সম্মুখে।

জানি আমি এই দুর্বাদলশ্যামরাত্রি, এই জলরেখা
আমাকে অভয় দেবে, কমনীয় শীতল পল্লব
সুতৃপ্তির মেঘ হয়ে ছায়া দেবে ; আর আমি একা
পথ হেঁটে পার হব ; অথচ এ বনভূমি আশ্চর্য নীরব।

অরণ্যে পর্বতে ভয় ; স্মৃতি হিম ; উজ্জ্বল প্রস্তরে
একটি আশ্চর্য চিত্র, শকুন্তলা, রয়েছে চিত্রিত ;
সুপ্রিয় হাতের স্পর্শে এ নির্জন অরণ্যের ঘরে
অন্ধকার আলো হয় ; তবু আমি এহেন নিভৃত

গভীর অরণ্যে একা ; কাকজ্যোৎস্না রাত্রির মায়ায়
অরণ্য, পর্বত, বৃক্ষ আঁকা থাকে অবচেতনায় ॥

শোক

রণজিৎ সিংহ

তারপর পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সে বলল :

আমার মুখ আমি তুলে ধরলাম
একে রক্তাক্ত করো।
আমার হৃৎপিণ্ড শূন্যে দোলালাম
জখম করো।
আমার চোখ
মেঘের পাঁজর ফাটিয়ে রামধনু এনেছিল
আমাকে অন্ধ করো।
আমাকে পাহাড় গড়ো পাহাড়
নিঃসাড় কঠিন।

হঠাৎ শব্দে সে দেখল ঝর্না
ঝর্না হয়ে গেল নদী, নদী সমুদ্র।
সে আদিগন্ত ডুকরে উঠল :

আমাকে ভুলতে দাও ভালোবেসেছিলাম।

গন্ধর্বের শব

অনিরুদ্ধ কর

দীর্ঘদিন বসে আছি বৃষ্টিহীন পূর্ণ পিপাসায়
আবিষ্ট অম্বর ছেয়ে আছে কিছু ম্রিয়মান আলো
চেনা ও অচেনা পাখি স্বভাবের উচ্চারণে গায়
দিনের বিদীর্ণ শোভা ঘরে ঘরে প্রদীপ ছড়াল।

কে যেন খেয়ালবশে চিত্রগৃহে করেছে উৎসব
চতুর্দিকে রূপাবলী অমল তরঙ্গে বয়ে চলে ;
কী করে মেলাবে স্বপ্ন, মুগ্ধ এক গন্ধর্বের শব
মৃত্যুহীন প্রেমে বয় প্রবাহিত রূপার্ত গরলে।

পরাক্রান্ত বাসনার সেনাদল বহু অক্ষৌহিনী
স্থির পরাজয় আনবে। অন্ধকার কম্পিত শঙ্কায়!
জীবন-মৃত্যুর কড়ি দিয়ে কর মিথ্যে বিকিকিনি
গন্ধর্বের শব বয় বৃষ্টিহীন পূর্ণ পিপাসায়!

উৎসের গভীরে থেকে

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকারটাকে
বার দুই টোকা দিলাম
অনেক কাকুতি মিনতিতে
একটা তির্যক আলো
মাথা খুঁড়ল বারবার।

তবুও বোবা সেজে
দরজা দাঁড়িয়ে রইল।

বিষাক্ত সাপের ফনায়
ঘন ঘন মাথা নাড়ছে মন।

এই দেখে জীবনটা
কুঁকড়ে উঠল যন্ত্রণায়।

তারপর
ক্লাচে ভর দিয়ে
ঘোড়ার খুরের ঠোক্কর তুলে
এগিয়ে চলল
ছাল ছাড়ানো পথে।

কারণ
সে দেখতে পেয়েছে
একটা স্কন্ধকাটা অন্ধকার
সামনে সমুদ্র হয়ে
শাঁখ বাজাচ্ছে।

আপেক্ষিক তত্ত্ব

এদিশের কিপিয়ানী

[জর্জিয়া সোভিয়েত দেশের একটি প্রজাতন্ত্র। ৪০ লক্ষ অধিবাসী। 'গুর্জে'রা বহু নিপীড়িত পুরাতন জাতি। স্বতন্ত্র তাদের ভাষা, বিশিষ্ট তাদের জাতীয় ঐতিহ্য। সম্প্রতি তাদের ৎবিলিশি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা শিক্ষাও আরম্ভ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা অবশ্য পূর্বেই গুর্জে ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সে-দেশে তা বিশেষ আদৃত। এ গল্পটি একজন তরুণ গুর্জে লেখকের, প্রকাশিত হয়েছিল 'তরুণ স্তালিনিস্ট' নামক পত্রে। আমাদের জন্য ইংরেজীতে অনুবাদ করেন জর্জ দেলিদ্‌সে নামক আর একটি গুর্জে যুবক এর পূর্বে বাঙলায় গুর্জে গল্প অনূদিত হয়েছে কিনা জানি না।—সম্পাদক]

স্টুডিওর ভিতরের মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে একটি তরুণী। নগ্ন দেহ। হাতের আঙুলগুলো গালের উপরে চাপা। মাথাটা নুয়ে পড়েছে। বিস্ময়ভরা আয়ত চোখে নিজের দেহটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন এইমাত্র ওটা ওর নজরে এসেছে। উপরের জানালা পথে আলোর রশ্মিগুলোকে আকর্ষণ করে ওর গায়ের ধবধবে সাদা চামড়া ফসফরাসের মতো জ্বলছে।

একটু দূরে বসে আছে শিল্পী। গায়ের কালো রঙের সোয়েটার ওর চওড়া কাঁধ দুটো আর পেশল বুকখানাকে ঢেকে রাখতে পারে নি। পাশ থেকে তীক্ষ্ণ মুখখানা মনে হয় যেন কালো সোয়েটার আর কোঁকড়া চুলের ঘন-কালো পটের উপরে আঁকা। বুঝি বা শিল্পী ভুলে গেছে বিশ্ব-সংসার সব কিছু। এক অদ্ভুত অপূর্ব অভিনব সৃষ্টির সাধনায় ডুবে গেছে। অনুপ্রেরণায় ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে কাজের গতি, পাছে না এই অমূল্য মুহূর্তগুলি ব্যর্থ হয়ে যায়, মনসপটের অস্পষ্ট আবছা কল্পনা ফলকের বুকে না মূর্ত হয়ে ওঠে।

জীবন্ত মডেলটি যে ঘন ঘন ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে সে-দিকে খেয়াল নেই শিল্পীর। হয়তো বা শ্রান্তই হয়ে পড়ছে। খানিক পরে পরেই ওর স্ত্রী এসে যে ঘরের আগুনের কুণ্ডে কাঠ গুঁজে দিয়ে ঈর্ষা-কাতর চোখে তরুণীর দেহটার দিকে তাকিয়েই পরক্ষণে ছবিটাকে এক নজর দেখে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সে দিকে ওর নজর নেই।

শীতের সূর্য মেঘের আড়ালে ডুবে গেছে। কিন্তু শিল্পীর মনে হচ্ছে যেন উদয় হয়েছে এসে তার স্টুডিওর ভিতরে। কাজ করতে করতে একটু থামে তারপর দু-পা পিছিয়ে এসে ছবির বুকে নতুন আলোছায়ার খেলা পরখ করে দেখে।

স্টুডিওর দোর খুলে যায়। শীতের পোশাকে সর্বাঙ্গ মুড়ে বাজারের থলে হাতে শিল্পীর স্ত্রী এসে ঢোকে।

বাজারে যাচ্ছি। তোমার জন্যে আনতে হবে কিছু?

না।—ফিরে না তাকিয়েই জবাব দেয় শিল্পী।

সিগারেট-টিগারেট কিছু?

না, আছে।

বেশ, আমি যাব আর আসব।

শিল্পীর স্ত্রী বেরিয়ে যায়।

আবার স্টুডিওর ভিতর নিস্তব্ধ। রঙের উপর রঙ চড়ে। নীরবে ছবি আঁকার কাজ এগিয়ে চলে। শুধু আগুনের কুণ্ডের ভিতর থেকে জেগে-ওঠা ফোঁসফোঁসানি সে নীরবতা ভঙ্গ করে চলেছে।

হঠাৎ মঞ্চের উপরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ওঠে। চকিতে শিল্পী মুখ ফিরিয়ে তাকায়। মুক্তবসনা মডেলের মুখে লাজুক হাসি।

কি ব্যাপার? ক্লান্ত লাগছে?

না গো না। এখানটা বড্ডো ঠাণ্ডা। একটু গরম হয়ে নি। শিল্পীর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই লাফিয়ে মেঝের উপরে নেমে পড়ে তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসে আগুনের কুণ্ডটার কাছে।

ধর, এটা নাও, জড়িয়ে বস—লম্বা গরম কোটটা ওর দিকে এগিয়ে দেয় শিল্পী। কোটটা পরে নিতেই মেয়েটি যেন ডাইনীর মতো ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু দেখা যায় দু-পায়ের গোড়ালির উপরের গাঁট আর হাসি হাসি গোলগাল মুখখানা। বুঝি বা স্টুডিওর ভিতরের আলো নিভে যায়।

আগুনের সামনে এসে বসে মেয়েটি। সিগারেট হাতে নিয়ে শিল্পীও একটু সরে এসে কাছে বসে। দুজনেই চুপচাপ। হঠাৎ মেয়েটির হাঁটুর উপর থেকে আবরণ খসে পড়ে। বড়ো বড়ো চোখ করে শিল্পী তাকিয়ে রয়েছে বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুটা ঢেকে ফেলে। শিল্পীর ঠোঁটের কোণে একটি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়।

হঠাৎ দোরটা আওয়াজ করে ওঠে। কে যেন এসে ঢোকে পাশের ঘরে। মেয়েলী জুতার খুট খুট শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসে। শিল্পীর স্ত্রী ফিরে এসেছে। হয়তো কিছু একটা ভুলে ফেলে গেছে। নিশ্চয়ই সে। আসছে স্টুডিওর দিকে। দোরের দিকেই এগিয়ে আসছে। আর এক মিনিটের মধ্যেই এসে…

খোসা ছাড়ানো পাকা বাদামের মতোই গায়ের লম্বা কোটটা খুলে মডেল বেরিয়ে আসে। জুতা খুলে ফেলে হালকা পায়ে ছুটে মঞ্চের উপরে এসে ওঠে। পরক্ষণেই আবার মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দু-চোখে ভয়, দ্রুত নিশ্বাসে বুকখানা ওঠা নামা করছে। শিল্পীও ইতিমধ্যেই এসে বসেছে তার ছবির সামনে। হাতে তুলি, 'নিঃশব্দে' এঁকে চলেছে।

স্টুডিওর দোর খুলে যায়।

জান, মাত্র তিনটি টাকা নিয়েই বাজারে যাচ্ছিলাম। টাকাকড়ি রেখেছ কোথায় ?

আমার প্যান্টের পকেটে। শিল্পীর গলাটা একটু কাঁপা কাঁপা।

স্টুডিওর দোরটা বন্ধ হয়ে যায়। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে শিল্পী আর তক্ষুনি দেখতে পায় যে তুলিটা উলটো করে ধরে আছে।

অনুবাদক / **সত্য গুপ্ত**

পরশুরামের অতুল কীর্তি

মনোনীত সেন

জমদগ্নি মুনির পুত্র পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন ; এমনকি সদ্যঃপ্রসূত ক্ষত্রিয়সন্তানগণ এবং গর্ভিণী ক্ষত্রিয় রমণীগণও তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, ইহা প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত আছে। পরশুরাম কুরুক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী রামহ্রদ নামক তীর্থস্থানে অবস্থিত পঞ্চহ্রদ (সমন্তপঞ্চক) ক্ষত্রিয়রুধির দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া পিতৃ-পিতামহদিগের তর্পণ করিয়াছিলেন। পরশুরামের এই দারুণ বিভীষিকা-সৃষ্টির মূলীভূত কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম-প্রবর্তনের ও তাহার আনুষঙ্গিক পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, শাস্ত্রসমূহের বিভিন্ন স্থলে বিক্ষিপ্ত এই সম্পর্কে বিবরণ সমুদয় গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ ও বিশ্লেষণ করিলে এইটিই প্রতিভাত হইয়া উঠে। কথিত হইয়া থাকে, হৈহয়াধিপতি কার্তবীর্য অর্জুন জমদগ্নিমুনির হোমধেনুর বৎসকে বলপূর্বক হরণ করেন, এবং উহা হইতেই এই সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়। কিন্তু ইহার প্রকৃত রহস্য মহাভারতের অনুশাসন পর্ব, ১৫২ অধ্যায়ে স্পষ্ট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। লিখিত আছে, "কার্তবীর্য কহিলেন, 'আমি সন্তুষ্ট হইলে জীবগণের সৃষ্টি এবং রোষাবিষ্ট হইলে সমুদয় জীবকে বিনাশ করিতে পারি। অতএব ব্রাহ্মণ কখনই আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয় কখনই প্রজাপালন করিতে সমর্থ হয় না ; তুমি (পবনদেব) এই হেতুনির্দেশ পূর্বক ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়কে অপেক্ষা-হীন বলিয়া কীর্তন করিলে, কিন্তু আমার মতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যজ্ঞাদিচ্ছলে ক্ষত্রিয়কে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করে, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা কখনই ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করে না। প্রজা প্রতিপালন করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম। ব্রাহ্মণেরা সেই ক্ষত্রিয়কে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করে ; তবে ব্রাহ্মণ কিরূপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল ? তুমি আকাশ হইতে যাহা বলিলে উহা মিথ্যা। অতঃপর আমি ভিক্ষোপজীবী আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণগণকে নিশ্চয়ই পরাজিত ও বশীভূত করিব। ত্রিলোকমধ্যে কি দেবতা, কি মনুষ্য

কেহই আমাকে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমি কখনই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহি। আজি আমি নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণপ্রধান জগৎকে ক্ষত্রিয়প্রধান করিব। সমরাঙ্গণে কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে।' মহাবীর কার্তবীর্য এইরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিলে আকাশবাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী তাহার বাক্য শ্রবণে একান্ত শঙ্কিত হইলেন।

"তখন পবনদেব অন্তরীক্ষ হইতে কার্তবীর্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জুন! তুমি এক্ষণে এই দূষিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার কর। উঁহাদিগের অপকারের চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তোমার রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইবে। উঁহারা তোমাকে হয় বিনষ্ট, নয় রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিবেন।"

তৎকালীন সমাজপতিগণ তথা ব্রাহ্মণগণ নারীজাতির প্রতি কিরূপ শুভদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় শাস্ত্রোক্তি হইতে তাহা সুপরিস্ফুট হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, এইরূপ বহু নিদর্শন শাস্ত্রসমূহের বিভিন্ন স্থলে পরিলক্ষিত হয়।

"স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই রতিপ্রিয় এবং পুরুষসংসর্গ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট সুখ আর কিছুই নাই, এমনকি বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও উহাদের তাদৃশ প্রীতিপ্রদ নহে। স্ত্রীলোকেরা অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। তৎকালে প্রচণ্ড সূর্যকিরণসন্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া গমন করিলেও তাহাদের পদতল ব্যথিত হয় না।...দেখুন সহস্র স্ত্রীলোক মধ্যে কথঞ্চিৎ একটি পতিব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ হয়, তৎকালে উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্তা, পুত্র ও দেবরের অপেক্ষা করে না, আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যস্ত থাকে। ইহলোকে বৃদ্ধারাও কামজ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে।" (মহাভারত—অনুশাসন পর্ব, ১১৯ ও ১২১ অধ্যায়)

যুধিষ্ঠিরের উক্তি, "কামিনীগণ অশেষ দোষের আকর। উহারা যে কোন্ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও কোন্ পুরুষের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। উহারা ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা পুরুষদিগকে বিমোহিত করে। উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোন পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণ ভক্ষণ করিতে

অভিলাষ করে, তদ্রূপ উহারা নূতন নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। কামিনীগণ সমুদয় মায়াই অবগত আছে। পুরুষেরা রোদন করিলে উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে উহারা অপ্রিয় ব্যক্তিকেও প্রিয় সম্ভাষণ দ্বারা গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্রকর্তা শুক্রাচার্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। যে ব্যক্তি উহাদের পূজা করে, আর যে ব্যক্তি উহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, উহারা সেই উভয়বিধ পুরুষের প্রতি সমভাবে আসক্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক এক্ষণে আমার মনে বোধ হইতেছে উহাদিগকে পরপুরুষ সংসর্গে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।" (মহাভারত—অনুশাসন পর্ব ৩৯ অধ্যায়)

ভীষ্মের প্রত্যুক্তি, "বৎস! তুমি স্ত্রীজাতির বিষয়ে যে যে কহিলে, তৎসমুদয়ই সত্য। ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু এই সমুদয়ের সহিত উহাদের তুলনা করা যায়। স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য বা ধর্ম নির্দিষ্ট নাই। উহারা বীর্যবিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও মিথ্যাবাদিনী। প্রজাপতি উহাদিগকে শয্যা, আসন, অলঙ্কার, অন্ন, পান, অনার্যতা, কটুবাক্য প্রয়োগ, প্রহার, বন্ধন অথবা বিবিধ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিলেও উহাদিগকে পরপুরুষ-সংসর্গে নিবৃত্ত করা যায় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্ব স্ব ধর্মে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না।" (মহাভারত—অনুশাসন পর্ব, ৪০ অধ্যায়)

যে সকল প্রদেশে এইরূপ সুচারু নীতিবোধ ছিল, তাহাদিগের অন্যতম সমাজপতি মহাত্মা জমদগ্নি তাঁহার পত্নীর প্রতি কিরূপ 'সুমধুর' ব্যবহার করিতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। জমদগ্নি তাঁহার পত্নী রেণুকার প্রতি যেরূপ নির্মম ও নৃশংস আচরণ করিতেন, মহাভারতে বর্ণিত নিম্নোদ্ধৃত উপাখ্যানটি তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"পূর্বকালে একদা ভগবান্ জমদগ্নি ক্রীড়ার্থ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার পত্নী রেণুকা সেই নিক্ষিপ্ত শরসমুদয় আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শর ও জ্যাশব্দে জমদগ্নির কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তিনি বাণনিক্ষেপে

নিতান্ত আসক্ত হইয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার পত্নী রেণুকাও বারংবার তৎসমুদয় আহরণপূর্বক তাঁহারে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন সময় সমুপস্থিত হইল, জমদগ্নি তথাপি শরনিক্ষেপে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পূর্বের ন্যায় শর পরিত্যাগ করিয়া রেণুকারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 'প্রিয়ে! তুমি শীঘ্র শরসমুদয় আনয়ন কর; আমি পুনরায় উহা পরিত্যাগ করিব।' জমদগ্নি এই আজ্ঞা করিবামাত্র রেণুকা শর আনয়নার্থ ধাবমান হইলেন। একে জ্যৈষ্ঠমাস, তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। পতিব্রতা রেণুকা সেই ভীষণ সময়ে স্বামীর নির্দেশানুসারে গমন করাতে আতপতাপে তাঁহার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তাপিত হইল। তখন তিনি অগত্যা অতি অল্পকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া পরিশ্রম অপনোদন করিলেন এবং পরিশেষে শরসমুদয় গ্রহণপূর্বক ভর্তার শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতি সত্বরে ঘর্মাক্তদেহে কম্পিত কলেবরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন জমদগ্নি তাঁহারে অবলোকন পূর্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, 'রেণুকে! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?' তখন রেণুকা স্বামীরে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। সূর্যকিরণে আমার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তপ্ত হওয়াতে আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াছিলাম; তাহাতে আমার বিলম্ব হইয়াছে।' সৌভাগ্যক্রমে, জমদগ্নির কথঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার হয় এবং তাঁহারই ঐকান্তিক প্রযত্নে দিবাকরের কঠোর কিরণ হইতে মস্তক ও চরণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছত্র ও পাদুকাদ্বয়ের উৎপত্তি হয়।" (মহাভারত—অনুশাসন পর্ব, ৯৫ ও ৯৬ অধ্যায়)

এ হেন রেণুকার পরপুরুষ-সংসর্গ সন্দেহ করিয়া জমদগ্নি স্বীয় পুত্র পরশুরাম কর্তৃক তাঁহার মাতা রেণুকাকে কুঠার দ্বারা নিহত করান। পিতৃকেন্দ্রিক সমাজের কি অপূর্ব প্রতীক! জগদ্বরেণ্য মনীষী এফ. এঙ্গেলস তাঁহার "দি অরিজিন অফ দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাণ্ড দি স্টেট" নামক পুস্তকের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "The overthrow of mother right was the world-historic defeat of the female sex. The man seized the reins in the house also, the woman was degraded, enthralled, the slave of the man's lust, a mere instrument for breeding

children. ...In order to guarantee the fidelity of the wife, that is, the paternity of the children, the woman is placed in man's absolute power; if he kills her, he is but exercising his right."

কার্তবীর্য অর্জুন হৈহয়দিগের অধিপতি ছিলেন। হৈহয়গণ আদিম জাতি হইতে সুদ্ভূত। ইনি মাহিষ্মতীপুরী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি লঙ্কাপতি রাবণকে বন্ধন করিয়া জয়োল্লাসে এই মাহিষ্মতীপুরে আনয়নপূর্বক বন্দী করিয়াছিলেন (বায়ুপুরাণ—৯৪ অধ্যায়)। এই প্রদেশে নারীগণের আধিপত্য পুরুষদিগের অপেক্ষা বহুতর অধিক ছিল। "কেহই তাহাদিগকে স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে পারিত না। তাহারা স্বৈরিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে ইতস্তত সঞ্চরণ করিত" (মহাভারত—সভাপর্ব, ৩০ অধ্যায়)। সুতরাং বলিতে হয় যে, মাহিষ্মতী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের লক্ষণসমূহের সমধিক প্রাদুর্ভাব ছিল, এবং ইহাদিগেরই প্রতিনিধি ছিলেন কার্তবীর্য।

কার্তবীর্য ও তাহার পুত্রগণের সহিত জমদগ্নির ঘোরতর সংগ্রাম হইতেই এই কুলক্ষয়-সমরানলের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে কার্তবীর্য ও জমদগ্নি উভয়েই নিহত হন (মহাভারত—বনপর্ব, ১১৬ অধ্যায়)। আদর্শবাদের সংঘর্ষ হইতেই যে এই যুদ্ধের উৎপত্তি তাহার আভাস পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধ, ১৬ অধ্যায়েও লিখিত আছে, "ব্রাহ্মণ-দ্বেষিগণের হৃদয়ে উৎকট ভয়ের সঞ্চার হয়, এরূপ একটি ভয়ানক নদী তাহাদের শোনিতের দ্বারা পরশুরাম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তৎকালের ক্ষত্রিয়গণের মতি পাপ পথেই নিরন্তর ধাবিত হইত; সুতরাং স্বীয় জনকের বধকে কেবল নিমিত্তমাত্র করিয়া, রাম সেই উৎপথগামী (বেদবিরুদ্ধচারী) ক্ষত্রিয়গণের নিধন করেন।"

পরশুরামের এই বিজয় অভিযান কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্তি সমূহ হইতে তাহা অক্লেশেই অনুমান করা যায়। "মহাবীর ভার্গব এইরূপে অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিলে, ক্ষত্রিয়ধর্মের ব্যতিক্রমনিবন্ধন দ্রবিড়, আভীর, পুণ্ড্র ও শবর-দেশীয় সমুদয় ব্যক্তিই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়" (মহাভারত—আশ্বমেধিকপর্ব ২১ অধ্যায়)। "পরিশেষে পরশুরাম সাগর-কূলস্থিত শূর্পারক-নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন" (মহাভারত—শান্তি-

পর্ব, ৪৯ অধ্যায়)। "তখন পরশুরাম সেই ব্রাহ্মণ-বর্জিত দেশে কৈবর্তদিগকে দেখিয়া যজ্ঞসূত্র প্রদান করিলেন এবং সেই কৃত-ব্রাহ্মণদিগকে নিজক্ষেত্রে স্থাপন করিয়া সুপ্রীত মনে বলিলেন," ইত্যাদি (স্কন্দপুরাণ—সহ্যাদ্রিখণ্ড, উত্তরকাণ্ড)। টলেমির 'প্রাচীন ভারত' নামক পুস্তকের সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত আছে, According to tradition Arya Brahmans were represented as having been settled by Parasuram in 61 villages in and around Brahmagara close to Malabar coast। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পোকক বলেন, পরশুরাম হইতেই পারস্য নামের উৎপত্তি। পরশুরাম যখন পারস্য-জয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই পারস্য নামের সৃষ্টি। বায়ুপুরাণের ৭৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "সাগরপর্যন্তগামী নদীসমূহের তীর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের দ্বার এবং দ্বাদশ যোজন পরিমিত সমস্ত ত্রিশঙ্কু দেশ অবস্থিত। এই দেশ শ্রাদ্ধে বর্জনীয়। কারস্কর, কলিঙ্গ ও সিন্ধু নদীর উত্তর দিগ্‌ভাগ এবং আশ্রম ও ধর্মহীন দেশ সকল প্রযত্নসহকারে পরিত্যাজ্য।" সূতপুত্র মহাবীর কর্ণও কহিয়াছেন যে, কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশপৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ এবং চেদীদেশ ব্যতিরেকে ভারতের অন্যত্র দেশসকল, শ্রেণী বিভাগানুযায়ী, শূদ্র ধর্মাবলম্বী, অথবা ধর্মদ্রোহী অথবা তস্কর কিংবা সঙ্কর (মহাভারত—কর্ণপর্ব, ৪১-৪৬ অধ্যায়)। এই বিবরণসমুদয় হইতে এইটি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে যে, পরশুরামের নব-অধিকৃত দেশসমূহে ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম (বর্ণাশ্রমধর্ম) এবং তৎসংলগ্ন পিতৃকেন্দ্রিক সমাজের প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই।

মহাভারত আদিপর্ব ১২৮ অধ্যায়ে বর্ণনানুযায়ী ক্ষত্রিয়কুলগৌরব যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনাদি সকলেই আদিম অনার্য পার্বত্য 'নাগ' জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং বলিতে হয় যে, আর্য-অনার্য নির্বিশেষে সকল যোদ্ধশ্রেণীই ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইত। এইটি স্মরণ রাখিলে, পরশুরামের এই দুর্নিবার পাশবিক কাণ্ড মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান বলিয়া প্রতীয়মান হয় না কি ?

উল্লিখিত বিবরণসমূহ হইতে বোধ করি, কেহই এমন বুঝিবেন না যে, একমাত্র পরশুরামের প্রযত্নে পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং পূর্বানুসৃত মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের সহসা আমূল পরিবর্তন ঘটে। কালের প্রভাবে এবং কার্যকারণের সংঘাতে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি-অর্জনের এবং সেই সম্পত্তি

স্বীয় ঔরসজাত সন্তানগণের মধ্যে সংরক্ষণের প্রবৃত্তি জনগণের মনে উদ্রেক হয়, তখনই উপলব্ধি হয় পিতৃকেন্দ্রিক সমাজের অপরিহার্যতা। এখন বিচার করিয়া দেখা যাক, এই মনোভাবের প্রথমবিকাশ কোন্ সময়ে হইয়াছিল।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সত্যযুগে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। তৎকালে মানবগণ পরস্পর উপদ্রব-রহিত ছিল, ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পর্ক ছিল না। বেদানুসারে ক্রিয়াকলাপ হইত না। (বেদের কি অস্তিত্বই ছিল না ?)। কৃষি প্রভৃতি মানুষী ক্রিয়াসকল বিলুপ্ত হইয়াছিল। সন্ন্যাসই (nomad) পরধর্ম ছিল। অসূয়া, রোদন, দর্প, কপট, বিগ্রহ, আলস্য, দ্বেষ, বৈগুণ্য, ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষা ও মাৎসর্য ('সভ্যতা-সত্তা'র বিষময় অবদান) ইহার নামগন্ধও ছিল না। সমান কর্মবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারাই প্রজা ছিলেন। (বর্ণাশ্রম কি ছিল না ?)। ত্রেতাযুগে সত্রানুষ্ঠানের (গৃহাদিনির্মাণের) বিধি আছে। এই যুগে মানবগণ পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। ঐ সময় মোহ তাহাদের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাব-বশতঃ মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভপরতন্ত্র, পরধন-গ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্যাকার্য বিবেকশূন্য হইয়া উঠিল। কোন কোন ব্যক্তি অত্যাদান (ধনাদির অতিগ্রহণ) হেতু সাম্পন্নিক হওয়ায় তাঁহাদের শরীরের গুরুত্ব হইয়াছিল, শরীরের গুরুত্ব হইতে শ্রান্তিবোধ, শ্রান্তিবোধ হইতে আলস্য, আলস্য হইতে ধনের সঞ্চয়-ইচ্ছা, সঞ্চয়-ইচ্ছা হইতে প্রতিগ্রহ এবং প্রতিগ্রহ হইতে লোভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সেই লোভ হইতে জিঘাংসা, জিঘাংসা হইতে মিথ্যা-কথা, মিথ্যাকথন হইতে কাম-ক্রোধ-মান-দ্বেষ-পারুষ্য-অভিঘাত-ভয়-তাপ-শোক-চিন্তা ও উদ্বেগাদি উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে যে, পিতৃকেন্দ্রিক-সমাজের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় ত্রেতাযুগে, তাহার পূর্বে কখনই নহে। প্রকৃতপক্ষে, পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ প্রবর্তনের সূত্রপাত হয় নহুষের (যযাতির) রাজত্বকালে এবং পর্যবসিত হয় পরশুরামের সময়ে, অর্থাৎ ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিস্থলে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সমগ্র ত্রেতাযুগব্যাপী এই দীর্ঘকাল ইহার জন্য অধ্যবসায় করিতে হয়। আজিও আমাদের দেশে কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ বিদ্যমান আছে।

পিতৃকেন্দ্রিক-সমাজ প্রবর্তকগণ সম্যক বুঝিয়াছিলেন যে, নরনারীর এই

চিরাচরিত যোনিবিচারশূন্য অবাধ দৈহিক মিলন সহসা নিরোধ করিলে আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা ও আনুষঙ্গিক সমাজবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এই উপলব্ধি-বশেই তাঁহারা বিচক্ষণতার সহিত এবং সাময়িক প্রয়োজন হিসাবে সমাজ-ব্যবস্থার এমন একটি মধ্যপন্থা উদ্ভাবন করিলেন, যাহা দ্বারা সন্তানের জন্মদাতার প্রকৃত পরিচয় ও নারীর একাধিক পুরুষসঙ্গমের আসক্তি, উভয়েরই কোনরূপ অন্তরায় না হয়। তাঁহারা স্থির করিলেন, "ঋতুকালে (রজোদর্শন হইতে ষোড়শ দিবস পর্যন্ত) পতি পরিত্যাগ পূর্বক পুরুষান্তর সংসর্গ করিলেই স্ত্রীদিগের অধর্ম হয়, কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে তাহাতে তাহাদের কোন পাপ নাই" (মহাভারত—আদিপর্ব ১২২ অধ্যায়)। (এঙ্গেলসের missing link ?)। এই বচনটির গূঢ় তাৎপর্য বুঝিতে হইলে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সহায়তা লইতে হয়। চরকসংহিতার চিকিৎসা স্থান, ৫ম অধ্যায়ে লিখিত আছে, "দিনে ব্যতীতে নিয়তং সঙ্কুচিত্যম্বুজং যথা। ঋতৌ ব্যতীতে নার্য্যাস্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা ॥" যেমন দিবাবসান হইলে পদ্ম সঙ্কুচিত হয় তদ্রূপ ঋতুকাল অতিক্রান্ত হইলে নারীগণের যোনিও (জরায়ুর দ্বার) সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ, ঋতুকাল গত হইবার পর হইতে ঋতুর পুনরাগমন পর্যন্ত নারীগণের সন্তানসম্ভাবনা থাকে না। বশিষ্ঠসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, গর্ভবতী স্ত্রী প্রসবকাল পর্যন্ত ইচ্ছামতো পুরুষের সহিত মৈথুনভাবে থাকিতে পারিত। ঐ গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে আবার লিখিত আছে যে, যে সকল স্ত্রীলোকের প্রসব আজকাল হইবে, তাহারাও স্বামিসহবাস করিতে পারিবে। অতএব ইহাই প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে যে পূর্বোল্লিখিত "ইচ্ছামত পুরুষ" পরপুরুষকেই বুঝাইতেছে। উক্ত বর্ণনাসকল মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ হইতে পিতৃকেন্দ্রিক সমাজে ক্রমপরিবর্তনের একটি পরিষ্কার চিত্রের পরিচয় দেয় না কি ?

পরিশেষে আর একটি কথা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না, যদিও কথঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে কথিত আছে, "কলিযুগ ক্ষয় হইলে পুনরায় সত্যযুগ সমুপস্থিত হয়।" আমরা সকলে সমবেতকণ্ঠে কহিয়া থাকি যে, পুরাকালের ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, অর্থাৎ বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ কোনটিই তাঁহাদের অজ্ঞেয় বা অজ্ঞাত ছিল না। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সত্যযুগের আসন্ন পুনরাবির্ভাবের পূর্বাভাস সারা বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে কি না কে বলিতে পারে ?

পত্রিকা প্রসঙ্গ

উত্তরণ ॥ তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩৬৭। সম্পাদক : এনামুল হক। উত্তরণ প্রকাশনী ; ৮০, ঝুলনবাড়ি ; ঢাকা—১। দু টাকা ॥

পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত 'উত্তরণ' সাহিত্য পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটির প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিপুল কলেবর, সুমুদ্রিত এই সঙ্কলনটি প্রকাশের পেছনে সম্পাদকের যে সাহিত্যপ্রীতি, নিষ্ঠা ও পরিকল্পনার পরিচয় পেয়েছি—নিঃসন্দেহে তা অভিনন্দনযোগ্য। এই পত্রিকাটির অঙ্গসজ্জা, বিশেষ করে সাদেক খান লিখিত 'পূর্ব-পাকিস্তানের সমকালীন চিত্রকলা' প্রবন্ধটির সঙ্গে মুদ্রিত পিকাসো ও জয়নাল আবেদীন প্রমুখ কয়েকজন পাকিস্তানী শিল্পীর শিল্পকলার যে কয়েকটি নিদর্শন মুদ্রিত হয়েছে তার পেছনে নিছক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নেই এবং অধিকাংশ ছবিই সংরক্ষণযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন লেখকের রচনা পত্রিকাটিকে এক বিশেষ তাৎপর্য ও মর্যাদা দিয়েছে।

প্রধানত রাজনৈতিক কারণে এবং কিছু পরিমাণে ঔদাসীন্যের জন্য পূর্ববঙ্গের বর্তমান শিল্প-সাহিত্য-প্রয়াসের বিশেষ খবর আমরা রাখি না। এই একটি প্রত্রিকা বা কোনো বিশেষ সংখ্যা মারফত তার সর্বাঙ্গীন পরিচয়লাভও সম্ভব নয়।

তথাপি সাহিত্যে ঐতিহ্য, বাস্তবতাবোধ এবং আধুনিক নিরীক্ষার নানা সমস্যা যে ওঁদেরও বিশেষভাবে চিন্তিত করে ; পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনীতির সামনে অসহায় ও কিছু পরিমাণে বিমূঢ় শিল্পী-সাহিত্যিকরাও যে 'নৈরাশ্যবাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত সাহিত্যের জন্য' (রণেশ দাশগুপ্তের একটি প্রবন্ধ) সচেতন প্রয়াসী—এই সংখ্যায়ই তার নানা নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ডলারের অনুপ্রবেশ ওদেশের সাহিত্যিক রুচি ও নৈতিক মূল্যবোধকে যে নানাভাবে বিপর্যস্ত করতে চাইছে—শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু শিল্পী-সাহিত্যিক যে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এই খবরটিও পত্রিকা পাঠেই বোঝা গেল।

বলা বাহুল্য প্রায় সর্বক্ষেত্রে সাহিত্য-শিল্পের আলোচনায় দেশ বিভাগের সঙ্কীর্ণ সীমা অস্বীকার করা এবং সর্বরকম সাম্প্রদায়িকতাবোধমুক্ত থাকা লেখকদের পক্ষে সহজেই সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থ-সমালোচনা বিভাগে 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (ঢাকার অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ সম্পাদিত) ও 'নজরুল সাহিত্য' এই তিনটি গ্রন্থের সমালোচনা পড়ে

দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ল আমাদের সাময়িক পত্রিকা অধ্যুষিত পশ্চিমবাংলায় পুস্তক-সমালোচনার নামে প্রায়ই কি নির্মম অশিক্ষা ও পক্ষপাতদুষ্টতার পরিচয় দেখতে হয়। 'বাংলায় লঘু সঙ্গীতের আধুনিক রূপ' প্রবন্ধটিতে খান আতাউর রহমান লিখছেন, "রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের যে খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম আমরা, গণসঙ্গীত আন্দোলন সেই খেই তুলে দিয়ে গেল আজকের রচয়িতাদের হাতে। ভারতীয় গণনাট্য প্রতিষ্ঠানের (IPTA) শিল্প-প্রচেষ্টাকে আর কোন স্বীকৃতি না দেওয়া হোক এটুকু দিতেই হবে যে, সে প্রচেষ্টা দেশের লঘু-সঙ্গীতকে এক চরম অবনতির হাত থেকে বাঁচিয়েছে।" আশ্চর্য যে আয়ুবশাহীর আমলে একটি পাকিস্তানী পত্রিকা যখন অত্যন্ত সরলভাবে এই স্বীকৃতি জানায় তখন আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের দেশস্তম্ভ পত্রপত্রিকা সে তথ্য (এবং এ জাতীয় নানা ঘটনাই) কেমন সহজে ভুলে যায়।

এ. কে. নাজমুল করিম 'সাম্প্রতিক সাহিত্য-শিল্পের সমস্যা' প্রবন্ধে এক জায়গায় দুঃখ করে লিখেছেন, "পশ্চিম বঙ্গ থেকে প্রকাশিত নামকরা "শারদীয় সংখ্যা" সমূহে গল্প উপন্যাসের সাথে সাথে সুলিখিত প্রবন্ধেরও অভাব হত না; কিন্তু আজকাল প্রবন্ধ মেলাই দুষ্কর। পূর্ব পাকিস্তানেও পত্র-পত্রিকা প্রকাশে অনুরূপ অভাব দেখতে পাই।" প্রবন্ধটির এই অংশের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ পূর্ববঙ্গের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের যতই উন্নাসিক-ঔদাসীন্য থাক—পশ্চিমবাংলার শিল্প-সাহিত্যের যাবতীয় সংবাদ এঁরা রাখেন—তার প্রমাণ বিভিন্ন প্রবন্ধে আছে। আমাদের আধুনিক চিত্র, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য—সবই এঁদের অভিনিবিষ্ট করে। এঁরা গুণগ্রাহী —ফলত সৎ ও সার্থক শিল্পকে অভিনন্দন জানান, প্রয়োজনে শিক্ষাও নেন। সে কারণেই আত্মসমালোচনা প্রসঙ্গে এঁদের আক্ষেপোক্তি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ চিন্তার কারণ আছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য 'পরিচয়' আজও পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অন্যান্য পত্রিকার কাছে তাই বিনীত নিবেদন—তাঁরা বছরে একবার পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের একটি সৎ ও নিরপেক্ষ সার্ভে (নিছক নিয়মরক্ষার কারণে নয়) এবং উভয় বঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিকদের লেখা ও ছবির একটি যুক্ত সংখ্যা প্রকাশ করার চেষ্টা করলে হয়তো আমরা নিজেরাই বিশেষ লাভবান হব।

কজ্জল সেন

সাম্প্রতিক সাহিত্য

আমেরিকায় শ্রেণীবৈষম্য

যুদ্ধোত্তর যুগে পুঁজিতন্ত্রের নাকি মৌলিক রূপান্তর সাধিত হয়েছে—পুঁজিতন্ত্র এখন আর পুঁজিপতিদের নয়, জনসাধারণের। উৎপাদন ব্যবস্থায় জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশেষজ্ঞ ম্যানেজার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। উৎপাদন যন্ত্রের চাবিকাঠি এখন তাদেরই হাতে। পুঁজিপতি এখন আর এমনকি তার নিজের কারখানারও কর্তা নয়। তদুপরি তার চরিত্রেরও মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। সে এখন আর মুনাফাশিকারী নয়, জনসাধারণের সেবক। এদিকে অভূতপূর্ব বৈষয়িক উন্নতির ফলে জনসাধারণ এখন দুধে-ভাতে আছে। মজুরেরা নিজের মোটরে চেপে এখন কারখানায় যায়, রেফ্রিজারেটার-টেলিভিশন রাখে। ফলত শ্রেণীবৈষম্য বিদূরিত হয়েছে। প্রতিভাবানের জন্য উন্নতির সর্ববিধ পথ খোলা আছে। অতএব মিছিমিছি বিপ্লব ইত্যাদির ঝুঁকি নেওয়া কেন! সমাজবাদের যা প্রতিশ্রুতি পুঁজিতন্ত্রই তো তা পূরণ করেছে।

সমাজবাদের বিরুদ্ধে পুঁজিতন্ত্রের তত্ত্ববাগীশদের এইটেই হচ্ছে শেষতম যুক্তি। বেশ চকচকে যুক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়।

জনসাধারণের পুঁজিতন্ত্র তত্ত্বের পক্ষে বা বিপক্ষে যা কিছু বলার আছে তার সবটুকু খতিয়ে দেখার জন্য অবশ্য এ-প্রবন্ধের অবতারণা নয়। জনসাধারণের পুঁজিতন্ত্রে শ্রেণীবৈষম্য লোপ পেয়েছে এই সিদ্ধান্তটাই শুধু এখানে যাচাই করে দেখা হবে, প্রধানত ভান্স পাকার্ডের সদ্য প্রকাশিত 'স্টেটাস সিকার্স' গ্রন্থটির ভিত্তিতে। আর যে দেশের বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তটি

The Status Seekers by Vance Packard. Longman's Green. 21s.
The Hidden Persuaders by Vance Packard. Longman's Green. 18s.

যাচাই করে দেখা হবে তা হচ্ছে আমেরিকা, যাকে বলা চলে জনসাধারণের পুঁজিতন্ত্রের পিতৃভূমি।

ভান্স পাকার্ড হচ্ছেন একজন মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক। 'স্টেটাস সিকার্স' তার দ্বিতীয় গ্রন্থ। প্রথম বই 'হিডেন পারসুয়েডার্স'-এ পাকার্ড দেখিয়েছিলেন কীভাবে মুষ্টিমেয় পণ্যউৎপাদক পণ্য বিক্রয়ের জন্য গণসংযোগের মাধ্যমগুলি (mass communication media) ব্যবহার করে 'মনোবিজ্ঞানের কলাকৌশলের সাহায্যে জনসাধারণের অজ্ঞাতে তাদের চিন্তানিয়ন্ত্রণের (thought control) প্রয়াস পাচ্ছে। তাদের এই সর্বগ্রাসী অভিযান এমনকি শিশুমনকেও বিকৃত করে তুলছে। আমেরিকার ছেলেমেয়েরা কমার্শিয়েল টেলিভিসনের কল্যাণে নার্সারী রাইমস শেখবারও ঢের আগে শেখে বিয়ার কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের গান। শুধু পণ্য বিক্রয়ের জন্যই নয়, রাজনীতি বিক্রয়ের জন্যও ক্রমশ বেশী পরিমাণে এই ধরনের mass persuasion techniques-র সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। গত ১৯৫৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রার্ট উভয় পক্ষই প্রচার কার্যের জন্য প্রধানত নির্ভর করেছিলেন পেশাদার বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠানের উপর। আর এই বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রচার-অভিযানে ভোটদাতাদের বিচার-বিশ্লেষণশীল সচেতন মনের কাছে ততটা আবেদন জানান নি, যতটা প্রয়াস পেয়েছিলেন তাদের অবচেতন মনে কতগুলি প্রতীক (image) মুদ্রিত করে দেবার।

অরওয়েল দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন ১৯৮৪ সালে কমিউনিস্ট দেশগুলিতে চিন্তানিয়ন্ত্রণের উন্নততর পদ্ধতির সাহায্যে মানুষকে রোবোটে পরিণত করা হবে। কিন্তু পাকার্ড 'হিডেন পারসুয়েডার্স' গ্রন্থে বিজ্ঞাপনদাতাদের টেকনিকের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যাবে কমিউনিস্ট দেশে নয়, অরওয়েলী দুঃস্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা চলেছে মুক্ত দুনিয়ার পীঠস্থান আমেরিকাতেই।

পাকার্ড বেশ কিছুকাল সংবাদিকতা করেছেন। তার ফলে দুরূহ বিষয়কে সহজ এবং চিত্তাকর্ষক করে বলবার কৌশল তার অধিগত হয়েছে। 'হিডেন পারসুয়েডার্স' তাই প্রায় ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়।

'স্টেটাস সিকার্স' আয়তনের দিক থেকেই শুধু 'হিডেন পারসুয়েডার্স'-এর থেকে বড়ো নয়—আলোচনার ক্ষেত্রও এখানে ব্যাপকতর ও গভীরতর।

'স্টেটাস সিকার্স'-এ পাকার্ড পর্বতপ্রমাণ তথ্য সহযোগে দেখিয়েছেন আমেরিকায় শ্রেণীবৈষম্য দূর হয়েছে বা হচ্ছে এই দাবির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। শ্রমিকের বৈষয়িক উন্নতি অবশ্য কিছুটা হয়েছে কিন্তু তাতে করে তাদের শ্রেণীমর্যাদার কোন পরিবর্তন হয় নি। কেননা, ধনীরা ইতিমধ্যে আরও ধনী হয়েছে। বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি আরও বৃহত্তর হয়েছে। এখন আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মাত্র ২% শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্ত। যাদের আয় বাৎসরিক এক লক্ষ ডলার, কোন এক সাম্প্রতিক বৎসরের হিসাবে দেখা যায়, তাদের সংখ্যা একের পাঁচ ভাগ বেড়েছে। যাদের বাৎসরিক আয় পাঁচ লক্ষ ডলার ১৯৪৫ সালের পরবর্তীকালে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ফলত আথিক সঙ্গতির বৈষম্য মোটেই দূর হয় নি। শ্রেণীভেদ এখন বরং আরও দুস্তর হয়েছে। তলা থেকে শুরু করে সমাজের উচ্চতম স্থানে আরোহন করা এখন প্রায় অসাধ্য হয়ে পড়েছে।

পাকার্ড অবশ্য মার্কসবাদী নন—শুধু উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি শ্রেণীভাগ করেন নি। শ্রেণী বলতে তিনি বুঝিয়েছেন : "...any group of people within a population who have a common status or origin that tends to set them apart—and who develop a style of life that emphasises the apartness।" এই সংজ্ঞা অনুসারে পাকার্ডের মতে আমেরিকায় দুই ধরনের শ্রেণী বিভাগ বিদ্যমান আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বৈষয়িক সঙ্গতিগত বিভাগ, অপরটি জাতিগত বিভাগ।

বৈষয়িক সঙ্গতির দিক থেকে আমেরিকানদের পাকার্ড দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—ডিপ্লোমা এলিট ও সাপোরেটিং ক্লাশ। ডিপ্লোমা এলিটকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—সত্যিকারের উচ্চবিত্ত শ্রেণী (Real Upper Class) ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী (Semi-Upper Class)। তেমনি সহায়ক শ্রেণী (Supporting Class) ও তিনভাগে বিভক্ত : আংশিক সফল শ্রেণী (Limited Success Class), শ্রমিক শ্রেণী ও সত্যকারের নিম্নবিত্ত শ্রেণী (Real Lower Class)।

সত্যিকারের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়ে শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির ডাইরেক্টর প্রমুখ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কোম্পানীর ম্যানেজার, টেকনোলজিস্ট, বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সফল ব্যবসাদার প্রভৃতি। লিমিটেড সাকসেস ক্লাশ বা আংশিক সফল শ্রেণী আসলে হচ্ছে

নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এরা প্রায় সকলেই হাই স্কুলের ডিপ্লোমাধারী, কেউবা টেকনিক্যাল কিংবা সেক্রেটারীয়াল স্কুলে পড়েছে। এরা কেউ আপিসের কর্মচারী, কেউবা কারখানার ফোরম্যান ইত্যাদি। সকলেই উচ্চাভিলাষী। সত্যিকারের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বস্তিবাসী এবং খাস আমেরিকাতেও প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মতো বস্তি আছে। (They live in decrepit slum areas that just about every American town has.—pp. 43)

এই পাঁচটি শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা নেই বললেই হয়। এরা স্বতন্ত্র এলাকায় বাস করে। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ক্লাবে নিম্নবিত্ত লোকের প্রবেশাধিকার নেই। এমনকি এদের গীর্জাও আলাদা। দৈবক্রমে যদি দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক পাশাপাশি বাড়িতেও থাকে—এমনকি যদি তাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয়ও হয়ে যায় তাহালেও কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে পরস্পরকে তারা নিমন্ত্রণ করে না। প্রত্যেকটি শ্রেণীর আচার-আচরণ, নীতিবোধ, যৌন ব্যবহারও স্বতন্ত্র ধরনের।

পাকার্ড লিখেছেন, আমেরিকানদের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্যের সূত্রপাত হয় দোলনা থেকেই। (Class differences begin in the cradle.—pp. 222) এখনকার শিক্ষাব্যবস্থা শ্রেণীভিত্তিক। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ইস্কুলে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পড়বার সুযোগ সীমাবদ্ধ। এই সব ইস্কুলের শিক্ষকেরাও উচ্চবিত্তশ্রেণীর মনোভাবের পরিপোষক। কর্মক্ষেত্রে কিন্তু এই সব স্কুল-কলেজের ছাপ অনেক বেশী মূল্যবান। কেউ যদি হার্ভার্ড, ইয়েল বা প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেনেটুনে কোন রকমে পাশ করতে পারে তাহলেও অপেক্ষাকৃত কম ফ্যাশানদুরস্ত বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রের থেকে সে বেশী মর্যাদা পাবে। চাকুরির ক্ষেত্রেও তারই দাম বেশী হবে। কে কোন ধরনের ইস্কুল বা কলেজ থেকে পাশ করেছে তারই উপর নির্ভর করে কর্মক্ষেত্রে কে কতটা সুযোগ পাবে। আর যেহেতু নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের এই সব বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ সীমাবদ্ধ তাই কর্মক্ষেত্রেও তাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ। কিছুকাল আগে 'ফর্চুন' পত্রিকা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে যে জরিপ করেছিলেন তাতে দেখা যায় ৯০০ জন সর্বোচ্চ পদাধিকারীর মধ্যে শতকরা ৮ জন মাত্র শ্রমিক পরিবারের সন্তান। এদের দুই তৃতীয়াংশই হচ্ছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সন্তান-সন্ততি। এদের মধ্যে আবার যাদের বয়স ৫০ বছরের কম তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২½ জন শ্রমিক পরিবারের সন্তান।

এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় শ্রমিক সন্তানের উন্নতির সুযোগ সম্প্রতিকালে আরও সংকুচিত হয়েছে। পাকার্ড তাই মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন: '...our educational system is still a far from perfect incubator of democracy.' (pp. 245)

এর ওপর আবার আছে জাতিগত বৈষম্য। কোনো নিগ্রো যদি যথেষ্ট বিত্তশালী হয়, যদি সে জ্ঞানী-গুণীও হয় তাহলেও সামাজিক মর্যাদায় শ্বেতাঙ্গ অপেক্ষা সে ন্যূনই থাকবে। বর্তমানে সামাজিক মর্যাদায় নিগ্রোদের থেকেও পিয়েরতোরিকানদের স্থান আরও নিচুতে। ইহুদীরাও আমেরিকায় বৈষম্যমূলক ব্যবহার পেয়ে থাকে।

আমেরিকায় জাতিগত বা আর্থিক সঙ্গতিগত বৈষম্য শুধু যে আছে তা-ই নয়—তা আবার অত্যন্ত জাঁকজমক করে বিজ্ঞাপিত করা হয়ে থাকে। এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হচ্ছে বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদি। সামাজিক মর্যাদার বিজ্ঞাপন হিসাবেই টেলিভিশনের এরিয়েল বেশি উঁচু করে টাঙান হয়। বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রদর্শন প্রবৃত্তিতে ইন্ধন যুগিয়ে পণ্য বিক্রয়ের প্রয়াস পায়। (হিডেন পারস্যুয়েডার্স-এ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে)। এর ফল সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়।

সমাজে ঊর্ধ্বগতি (upword mobility) স্তম্ভিত অথচ প্রত্যেকেই কৌলীন্য প্রয়াসী। জোনস্‌দের সঙ্গে তাল রাখতে অনেকেরই প্রাণান্ত হয়। কিস্তিতে বাড়ি পাওয়া যায়, গাড়ি পাওয়া যায়, রেফ্রিজারেটার-টেলিভিশন পাওয়া যায়—কিন্তু কিস্তিবন্দী সুখ মানসিক শান্তি দিতে পারে না। উচ্চাভিলাষ তাই অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক সংকট সৃষ্টি করে। যাদের অবস্থা পড়তির দিকে তারা মদ বা অন্যপ্রকার মাদক দ্রব্যে আশ্বাস খোঁজে। আর যারা উঠতির দিকে তাদেরও নতুন সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে নিজেদের অভ্যাসের সামঞ্জস্য করতে বেগ পেতে হয়। পুরনো বন্ধুদের বর্জন করে তখন তাদের নতুন বন্ধু খুঁজতে হয়। পুরনো বাসস্থান ছেড়ে অভিজাত এলাকায় গিয়ে তাদের বসবাস করতে হয়। যে কোনো উপায়ে তাকে নিজের বনেদীয়ানা প্রমাণ করতে হয়। এই প্রয়াস অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে। কিন্তু এই হঠাৎ-গজানো ধনীরা বনেদী অভিজাতদের কাছ থেকে অনেক সময়ই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পায় না। তার ফলে অনেক সময় এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় যে কৌলীন্যাভিলাষী আত্মহত্যারও প্রয়াস করে। অনেক

সময় দেখা যায় স্ত্রী হঠাৎ-ধনী স্বামীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। ফলত অনেক সময় বিবাহবিচ্ছেদও ঘটে। মর্যাদা সচেতনতার (status consciousness) ফল স্বরূপ আমেরিকানরা অনেকেই নানারূপ মানসিক ব্যাধিতে ভোগে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমেরিকায় শ্রেণীবৈষম্য তো লোপ পায়ই নি বরং তা আরও কঠোর হয়ে সামাজিক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। উপসংহারে পাকার্ড বলেছেন : The people of this country have become increasingly preoccupied with status...As a result, democracy is still more of an ideal than a reality. (pp. 357)

পাকার্ডের বইটি পড়তে পড়তে মনে হল, স্টেটাস সিকিং-এর দুর্লক্ষণ আমাদের দেশেও ক্রমশ যেন প্রকট হচ্ছে। আমাদের দেশের সমাজ-বিজ্ঞানীরা যদি এ-বিষয়ে অবহিত হয়ে সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন তাতে দেশের মঙ্গল হবে।

প্রদ্যোৎ গুহ

পুস্তক-পরিচয়

নন্দন তত্ত্ব ॥ সুধীরকুমার নন্দী। প্রকাশ মন্দির। পাঁচ টাকা ॥

বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যতত্ত্বের উপযুক্ত, উপভোগ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ বিশেষ নেই, যা আছে, তার বেশির ভাগ হয় কতকগুলি প্রবন্ধের উচ্ছ্বসিত হালকা বাণীবিন্যাস, নতুবা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মনীষীর উক্তি সংগ্রহ করে একটি কোটেশন-কণ্টকিত গ্রন্থ, তাতে নিজের মনের ও বুদ্ধির বিচার বড় দেখা যায় না। সাহিত্যতত্ত্বের এই অধোগতি সর্জমান বাংলা সাহিত্যের পক্ষে বিপজ্জনক সন্দেহ নেই, কেননা সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে যদি প্লেটো বা শেলীর মতো দৈবীই বলতে চাই তাহলে সৃষ্টিও দৈবের মতো শূন্যে রং ছড়াতে থাকবে, সুতরাং এর প্রকৃত বিচার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই দিক থেকে ডক্টর নন্দীর 'নন্দন তত্ত্ব' সাহিত্যতত্ত্ব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ডক্টর নন্দী মোট তেরোটি অধ্যায়ে সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে গ্রন্থটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা শিল্পতত্ত্ব প্রসঙ্গে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কয়েকজন শিল্পীর শিল্পমত প্রসঙ্গে। বক্রোক্তি, আর্টের মর্মকথা, আর্টে বাস্তবতা, আর্টে সার্বিকতা, শিল্পে অধিকারবাদ, শিল্পীর বৈরাগ্য ও শিল্পে প্রয়োজনবাদ। এবং দ্বিতীয়ভাগে পড়ে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ধারণা, অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ, রোলাঁর শিল্পদৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব ও হেগেলীয় শিল্পধারণা। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় বিভাগটি আলোচনার সংক্ষিপ্ততা ও বক্তব্যের বিরোধিতার জন্য অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব উল্লেখ করা যেতে পারে। ডক্টর নন্দীর মতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে অহংময় ব্যক্তিমায়ার আবরণে অনির্বচনীয় বস্তু সৃষ্টি হয়েছে, সেই সৃষ্টি সার্থক হয় প্রকাশে। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশে একান্ত বিশ্বাসী, এই শিল্পের প্রকাশ মানবের চরিত্রের মহৎ গুণ নিয়ে গড়ে উঠবে—

এখানে ডক্টর নন্দী রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন। কেননা, রবীন্দ্রনাথ কোথাও মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্তর গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে জীবনের বৃহত্তর ও দুর্লভতর অভিজ্ঞতার প্রকাশ যদি শিল্পে ঘটে তবে শিল্পের শাশ্বত মূল্য বেড়ে যাবে এবং যুগ-যুগান্তরের রসিক মানুষের কাছে সে-শিল্পের আবেদন কখনো ক্ষুণ্ণ হবে না। কোথায়ও সমগ্র মানব-চরিত্রকে প্রকাশের দিকে জোর দিয়েছেন। বিশেষ ও সামান্যের এই পার্থক্য লক্ষ্যগোচর। ব্যক্তিত্বের প্রকাশেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, এতে ভালমন্দ সুন্দর অসুন্দরের স্থান একই সঙ্গে। শিল্প সামাজিককে অবজ্ঞা করে গড়ে ওঠে না বরং তার মধ্যেই এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। তবে শিল্পী প্রয়োজনের মধ্যে নেই, অতিরিক্তের রাজত্বেই শিল্পের জন্ম। রবীন্দ্রনাথের এই বিভিন্ন দিকগুলি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বে রসবাদ, বিশেষ করে সৌন্দর্যবাদ কিভাবে সক্রিয় তার কোনো আলোচনা নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে সংগীত ও চিত্রের আলোচনা মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। সুরময় চিত্রের দিকেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব, এবং সাহিত্যসৃষ্টি বিষয়ে সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরূপণ তাঁর সাহিত্যধারণাকে ব্যাপকতর করেছে, ট্রাজেডির মধ্যে এই আলোচনা যথার্থ রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করতে হলে এগুলিকে বাদ দিলে চলবে না। সুতরাং এমনি অপূর্ণতা এই সব আলোচনায় রয়েছে। বিশেষ করে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত অধ্যায়ে ডক্টর নন্দীর স্ববিরোধিতা মারাত্মক। প্রথমে বলেছেন ভরত ভারতীয় রসবাদের উদ্‌গাতা, তারপরেই বলেছেন রসবাদের উদ্‌গাতা প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন সে কথা ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। আর ভরতের নাট্যশাস্ত্রের রচনা-সময় ডক্টর নন্দী নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন নি, শুধু অনুমান করে বলেছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকই গবেষণার প্রত্যন্ত সীমা। কিন্তু যতদূর জানা যায় ভরত দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছিলেন ও রসবাদ সংকলন করেছিলেন। মূলত ভাস ও কালিদাসের মধ্যবর্তী যে কোনো সময়ে ভরতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারি।

বক্রোক্তিবাদের কথা বলতে গিয়ে ডক্টর নন্দী যে অভিনব কথা বলতে প্রয়াসী হয়েছেন তা বিচার করে দেখা একান্ত প্রয়োজন। ডক্টর নন্দী বলেছেন যে কাব্যে যদি বক্রতার মধ্য দিয়ে রসের অধ্যাস না ঘটে তা হলে বাক্য কাব্য হয়ে উঠল না। অর্থাৎ বাক্যে বক্রতা থাকতে হবে। এই

কারণেই স্বভাবোক্তি কাব্য নয়, কারণ স্বভাবোক্তির মধ্যে বস্তুতান্ত্রিক ফটোগ্রাফিকতা রয়েছে। প্রথমত বুঝতে হবে বক্রতা কি, এবং বক্রতার সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ কতদূর। বক্তার অনভিপ্রেত অর্থেই যদি শ্রোতা আনন্দ লাভ করে তাহলেই বক্রতা এল। কিন্তু কবি যদি প্রত্যক্ষ ও অভিপ্রেত অর্থটি অনুভূতির রসে জারিত করে ছন্দস্পন্দে পাঠকের কাছে তুলে ধরেন, তাহলে কি কাব্য হয়ে উঠবে না? জীবনানন্দের:

সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা ;
খড় মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে ;
গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে ;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালী খড়ের ঘনস্তূপে ;

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে ;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে।
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনার মনে ;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

এখানে কবির কোন অভিপ্রেত অর্থকে না ধরে পাঠক অন্য অর্থ ধরে বক্রতাজনিত আনন্দ উপভোগ করে! যদিও কুন্তক বক্রোক্তি বলতে ভঙ্গি-বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু কুন্তকের গ্রন্থের ত্রুটি হল বক্রোক্তিকে রসের প্রকারভেদ বলে গ্রহণ করা। যদি রসেরই প্রকারভেদ বক্রোক্তি হয় তাহলে আমাদের কোনো বক্তব্য থাকে না, যদিও রস শব্দটাই গোলমেলে। কিন্তু কুন্তক ভণিতিবৈচিত্র্যের যে উল্লেখ করেছেন উদাহরণ দিয়ে তাতে শব্দের ও অর্থের বক্রতাই পরিলক্ষিত হয়। ভণিতিবৈচিত্র্য ছাড়াও কাব্য হয়ে ওঠে সোজা সহজ, বক্তব্য যদি অনুভূতিতে রঙীন হয়ে ওঠে। হয়তো এই রঙীন হয়ে ওঠাটাই কুন্তকের মতে বক্রতা, যেমন উপরোক্ত জীবনানন্দের কবিতায় শেষ স্তবকটিতে অতিশয়োক্তির ছোঁয়াচ লেগেছে। কিন্তু,

নীল জল···নির্মল চাঁদ
চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।
ঐ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল ;
তারা বাড়ি ফিরছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।

এখানে কি আমাদের মন একটুও আবেশে স্থিরমুগ্ধ হয় না এই শান্ত

চিত্রের রূপ-সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে! স্বভাবোক্তি অলংকারও নয়, বক্রোক্তিও নয় এবং বিশেষ করে ডক্টর নন্দীর বস্তুসত্যের যথাযথ ফটোগ্রাফিও নয়। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র-আলোচকেরা এ কথাটা প্রায়ই ভুলে যান যে বিভাব ঠিক পৃথিবীর বাহ্যবস্তু সত্য নয়, যখনই কাব্যের অবলম্বন হল তখনই কবিমনের গ্রহণ-বর্জন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে হৃদয়রসে স্নিগ্ধতা লাভ করল। স্বভাবোক্তিতেও এই কবিমন ও হৃদয় বস্তুসত্যকে জারিত করতে প্রস্তুত, তাই সে বক্রোক্তি ও অলংকারবিহীন হয়েও সে আমাদের মনে তদ্বিদ্হ্লাদ সৃষ্টি করতে পারে। বক্রোক্তির সঙ্গে কাব্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই, বক্রোক্তি কাব্যের অতিরিক্ত বস্তু, দিলে সৌন্দর্য বাড়ে, না দিলে কোনো ক্ষতি নেই। সুতরাং ডক্টর নন্দীর এই মন্তব্যে আমরা সায় দিতে পারি নে, "একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না বল্লে মনে নেশার রং লাগে না, কাব্যানন্দের আস্বাদন করা কাব্যরসিকের পক্ষে সহজসাধ্য হয় না।" (২ পৃঃ) কবির অভিজ্ঞতায় বিচিত্রের রূপ ইম্‌পালসের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে অপূর্ব সৌন্দর্যময়তায় প্রকাশ পেলেই কাব্য হয়েছে স্বীকার করতে পারি। সৌন্দর্য লক্ষণই কাব্যের মূল স্বভাবধর্ম। এখানেই ভারতীয় রসবাদ ধ্বনিবাদ পরিপূর্ণভাবে পাশ্চাত্ত্যের দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে।

আর্টের মর্মকথায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে ইন্দ্রিয়াতীতের রূপেরই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। ভাববাদী দার্শনিকদের অতি-অহংকেই এখানে আর্টের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, অ্যাবসলিউটের যথার্থ রূপই হল তাঁর মতে যথার্থ আর্ট। 'যিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত, সেই মহাসত্তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপদানের প্রয়াসই হলো আর্টের মূল কথা, শিল্পের পরমতত্ত্ব।' এতে দার্শনিক ব্র্যাডলির রিয়্যালিটিই প্রকাশিত হবে, তাই শিল্পের রাজত্বে সুন্দর অসুন্দরের কোনো ভেদ নেই, আছে রূপের প্রকাশের তাগিদ, অ্যাবসলিউটের মধ্যে যেমন পরোক্ষ অনুভূতি প্রকাশ পায়, শিল্পীর অপরোক্ষ অনুভূতিই শিল্পে রূপায়িত হয়। তিনি বলেছেন, 'শিল্প হল মানুষের চিন্ময়ীশক্তির লীলারূপ। মানুষ যেখানে বন্ধনমুক্ত, সেখানে সে ভগবান, সে ব্রহ্ম। তাঁর লীলায় বিশ্বসংসার সৃষ্টি হয়। আর ভগবান যেখানে নররূপে মোহগ্রস্ত সেখানে তাঁর লীলায় ফোটে শিল্পীর সৃষ্টি-কমল। জীবনের ও জগতের ভোগের আমন্ত্রণে শিল্পী প্রত্যুত্তর দেয়—সেই কাজটুকুই হল শিল্প। সে শিল্প হল মোহ মুগ্ধ ভগবানের চিন্ময় শক্তির আর এক প্রকাশ। এখানে আমরা বৈদান্তিক শংকরাচার্যের

'তত্ত্বমসি' তত্ত্বের আশ্রয় নিচ্ছি হেগেল ও ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের একটা সমন্বয় ঘটাবার প্রত্যাশায়।'

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে কাব্যরস বিশ্লেষণে সাংখ্য বেদান্ত মত গৃহীত হয় নি, এমন কথা বলি নে। কাশ্মীরী তাত্ত্বিকদের আলোচনায় যোগতন্ত্রের প্রভাবপাতও লক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলে তাঁরা বস্তু পৃথিবীকে এমনভাবে ডক্টর নন্দীর মতো উড়িয়ে দিতে চান নি। শংকরাচার্যের তত্ত্বমসি মন্ত্রে আস্থা স্থাপন করলে আমাদের পৃথিবীতে বাস করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কারণ জগৎ হচ্ছে একটা অধ্যাস, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো মিথ্যা, আসল সত্য হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম, যাঁকে লাভ করা যায় ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ধর্মকে লোপ করে। সুতরাং শংকরের এই ব্রহ্মকে স্বীকার করলে কাব্যপাঠে ও রসাস্বাদনে আমাদের কোনো স্পৃহা থাকে না। সবই মায়া বলে প্রতিভাত হয়, ব্যবহারিক সত্তাকে স্বীকার করলেও এই মায়ার ভয় দূর হয় না। কিন্তু সাহিত্যশিল্পে যদি মানব-জীবন ও জগতের বাস্তব সত্য প্রকৃত রূপায়িত না হয়ে ব্যবহারিক মায়াময় সৃষ্টি হত, তাহলে শিল্পে মানুষের মুক্তি সম্ভবপর হত না। দর্শনের বিচারে কাণ্টের ইমাজিনেশন অনেক ফলপ্রদ, সেখানে বস্তুসত্যকে স্বীকার করে সৌন্দর্যের ভেতর দিয়ে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করা অনায়াসসাধ্য। ব্র্যাড্‌লির রিয়্যালিটিকে স্বীকার করলেও বস্তুহীনতার দোষ খণ্ডায় না। ব্র্যাডলি বস্তুকে স্বীকার করেছেন মনের দাবিতে, কিন্তু এত অতি-অহংকেন্দ্রিক (solipsistic) ভাবনা যদি শিল্পে প্রকাশ পায়—তাহলে তা নৈরাজ্যবাদের মরীচিকাই সৃষ্টি করবে। শিল্পবিচারে মূল্যায়নের কথা অবশ্য স্বীকার্য, এখানে ভালমন্দের বিচার করতে হয়, কিন্তু ভালত্বের বিচার কি এই যা ব্র্যাডলির ভাষায়: wherever, and so far as, I feel myself positively affirmed, there, so far, is goodness. কিন্তু যে ভালমন্দ স্বীকৃত হয় সার্বিক জনহৃদয় সত্যের দাবিতে—তার বিচার কোথায়? দর্শনের যেমন বস্তু ও মনের সামঞ্জস্য বিধানই মূল সমস্যা, সাহিত্যেও তাই। দার্শনিক যেমন বস্তু ও মনকে স্বীকার করে অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করে শান্তি অনুভব করেন, সাহিত্যের পাঠকও তেমন বস্তু ও মনকে স্বীকার করে সৌন্দর্যের অমরাবতীতে প্রবেশ করে আনন্দজনিত রস অনুভব করেন। এই জন্যই বেলিন্‌স্কি সাহিত্যকে idealisation of reality বলেছেন।

সাহিত্য সম্পর্কে ডক্টর নন্দী হেগেলের মতকে স্বীকার করে নিয়ে সাহিত্যে

থিসিস অ্যান্টিথিসিস সিন্থেসিস স্বীকার করেন নি। কিন্তু সাহিত্যকে যদি বস্তুসত্য হিসাবে স্বীকার করি, তাহলে হেগেলের এই দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া অতি সুন্দরভাবে সক্রিয় দেখতে পাই। ব্যর্থ প্রেমিক কবি কীটস কবিতায় প্রিয়তমার নরমক্রীম বুকে বালিশের মতো মাথা পেতে শুতে চেয়েছেন, বাস্তব জগতে প্রিয়তমার অভাব (antithesis) কি কাব্যে সিন্থেসিস হয় নি !

কাব্যতত্ত্বকে দর্শনের দিক থেকে বিচার না করে মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বিচার করলে দোষ অনেকটা কেটে যায়, সৃষ্টিক্রিয়া প্রসঙ্গে অজ্ঞেয় রহস্যবাদও দূরীভূত হয় অনেকটা। শিল্পের দার্শনিকতা নির্ভর করে অন্তিমে, কিন্তু তার পূর্বে কগনিশনই মূল লক্ষ্য। ডক্টর নন্দী যদি এই দিক থেকে আলোচনা করতেন, তাহলে শিল্পের যাদু, যার রহস্য তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি, তা অনেকটা উন্মোচিত হত।

বইটির সব চেয়ে ত্রুটি হল স্ববিরোধী উক্তি। মনে হয় বইটি একই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনের লেখা। আর্টে বাস্তবতা প্রবন্ধে বলেছেন, “form এবং content এই দুইয়ে মিলিয়ে আর্টের সৃষ্টি হয়, এ কথা হল নরমপন্থীদের কথা। যাঁদের ধারণায় বলিষ্ঠতা নেই, তাঁরাই একথা বলবেন।” (২১ পৃঃ) অথচ হেগেলীয় শিল্পধারণা প্রবন্ধের ফুটনোটে বলেছেন : “হেগেলীয় শিল্পদর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্টেস শিল্প রূপ ও শিল্পভাবের এই একাত্ম মিলনকে সার্থক শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য বলেছেন। আমরা একথার অনুমোদন করি।” ফর্মকে যদি কাণ্টের দার্শনিক অর্থেও স্বীকার করি, তাহলেও এই দুই বক্তব্যের সামঞ্জস্য কোথায়ও ঘটে না।

শিল্পীর বৈরাগ্যে বৈরাগ্য কথাটি কি অর্থে ব্যবহার করেছেন তা বোঝা গেল না। আর্টে সার্বিকতা প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

“শুদ্ধ মাত্র, সাবজেকৃটিভ বা ব্যক্তিনির্ভর হ’লে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবে। এই আপত্তির উত্তরে আমরা অধ্যাপক কলিংউডের কথায় বলবো যে শিল্পমূল্য সব সময় নির্ণীত হয় ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা। ব্যক্তি না থাকলে শিল্প থাকে না। যাঁরা শিল্পে বা আর্টে এই sujectivityকে অস্বীকার করেন, তাদের ধারণা স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তুলনীয়।

“উপনিষদের ‘তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা’ তত্ত্ব এই ব্যক্তি-স্বার্থহীন নৈর্ব্যক্তিক আনন্দাস্বাদনের তত্ত্ব। যখনই আমরা নিরাসক্ত চিত্তে প্রকৃতির নিমন্ত্রণে যাই তখন তার সৌন্দর্যের অমরাবতী মুক্তদ্বার হয় আমাদের কাছে।” (৫২ পৃঃ)

বৈরাগ্য কি অর্থে প্রয়োগ করেছেন, তা না জানলে কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না, অথচ এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মন্ত্রটি বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের পর থেকে এমনভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে যে তাতে উপনিষদের দার্শনিকতা একেবারে লোপ পেয়েছে। ত্যাগই যদি ভোগ হয়, বা ভোগই যদি ত্যাগ হয়, তাহলে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অব্যবহিত সম্বন্ধ কি ? সৎকার্যবাদ তো একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, ত্যাগই ভোগ অলীক কল্পনা, ত্যাগের মধ্যে ভোগের কোনো প্রশ্ন নেই, আবার ভোগের মধ্যে ত্যাগেরও নয়। ত্যাগ করে ভোগ করা বস্তুকে ছাড়িয়ে শূন্যে আঁকড়ে থাকা। স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই শ্লোকের যে অর্থ করেছেন, তাই গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত, ‘তেন’ ঈশ্বরেণ যৎ কিঞ্চিৎ ত্যক্তং দত্তং ভবতি, তে নৈব ভুঞ্জীথা, এর মানে হল ‘অতএব তিনি যাহা প্রদান করেন, তাহা দ্বারা উপভোগ করিবে।’ ত্যাগের দ্বারা ভোগ নয়।

বইটির নামকরণ নন্দন তত্ত্ব, অথচ লেখকের প্রতিপাদ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অতীন্দ্রিয়ের ভাবরূপ প্রতিষ্ঠা—এ দুয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় অতি অবশ্য দরকার ছিল। আনন্দ যদি কাব্যতত্ত্বের মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে অতীন্দ্রিয়ের ভাবরূপ প্রতিষ্ঠা তেমন স্থান পায় না। কেননা আনন্দ ইন্দ্রিয়গত।

ভাষার মিষ্টত্ব ও সাবলীলত্ব অনস্বীকার্য। তবে পূর্ববঙ্গের উপভাষার পরসর্গ ‘সাথে’ ‘সঙ্গে’র পরিবর্তে বেমানান হয়েছে এবং অতি মিষ্টত্বের ও কাব্যত্বের জন্য বিসদৃশ হয়েছে, যথা ‘দোঁহে অভ্যথিত হয়েছে।’ বানান ভুল মারাত্মক, (ব্যঙ্গ্য>ব্যঙ্গ)।

বইটির অনেক ত্রুটি বেরিয়ে গেল, কিন্তু উপায় নেই। দর্শনের অধ্যাপকের লেখায় এই ত্রুটি থাকা শোভন হয় নি। তবে বাংলা সাহিত্যে এমনি চেষ্টার ঘাতপ্রতিঘাতেই প্রকৃত কাব্যতত্ত্ব সৃষ্টি হবে, এই আশায় এই গ্রন্থখানিকে অভিনন্দন জানাই।

বার্ণিক রায়

বিভূতিভূষণ ॥ চিত্তরঞ্জন ঘোষ। বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী। পাঁচ টাকা ॥

প্রত্যেক জাতিরই একটি স্বভাবধর্ম থাকে, এবং বাঙালীর স্বভাবধর্ম লিরিক্যাল —এ-কথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। তাই বাঙালী লেখক যত গল্প উপন্যাস লেখেন,

তার শতাংশ পরিমাণ প্রবন্ধ গ্রন্থও লিখিত হয় না, পঠিত হয় আরো কম। অথচ যদি আমরা সমালোচনা শাস্ত্রের প্রতি আরো একটু আগ্রহী হতাম, তবে আত্মপরীক্ষালব্ধ বিবেচনার দ্বারা রস-সাহিত্যকেও আরো উন্নত করতে পারতাম। একশো বছরের বাংলা উপন্যাসের এমন কোনো ইতিহাস এখনো রচিত হয় নি, যাতে আলোচিত হয়েছে বাঙালী ঔপন্যাসিকের বিশেষত্ব, তার সীমাবদ্ধতা ও কৃতিত্ব। অথচ আলোচনার উপযুক্ত তথ্যের অভাব নেই।

এমতাবস্থায় চিত্তরঞ্জন ঘোষ মহাশয় তিরিশের যুগের ও কল্লোলোত্তর অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের ওপর একটি সম্পূর্ণ পুস্তক রচনা করে কর্তব্যবুদ্ধি, বিবেচনা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমেই তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ভাবতে অবাক লাগে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়েও কোনো গ্রন্থ লেখা হয় নি।

সুতরাং চিত্তরঞ্জন ঘোষকে নিজের পথ নিজেকেই কেটে অগ্রসর হতে হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমি সববিষয়ে একমত হতে পারি নি, কিন্তু সমস্ত গ্রন্থটির মধ্যে সমালোচকের নিষ্ঠা-সততা-পরিশ্রমের এমন অভ্রান্ত চিহ্ন সর্বদা চোখে পড়ে যে সামান্য একটি পুস্তক সমালোচনায় সেই মতানৈক্য প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করছি।

লেখক সমগ্র গ্রন্থটিকে সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন—রবির আলোকে, সাহিত্যাদর্শ, শিল্পীমানস, প্রেম, অপূর্ব-চরিত-মানস, ছোটগল্প, রচনারীতি। এই অধ্যায়গুলি আবার আরো অনেক ছোট-ছোট ভাগে বিভক্ত। এই রীতি থেকেই বোঝা যায়, লেখক তাঁর আলোচনাকে বিভূতিভূষণেই কেন্দ্রিত, তাঁরই রচনায় সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছেন। ফলে বিভূতিভূষণের লেখক-সত্তার অনেক অনাবিষ্কৃত দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আলোচনা যদি ছড়িয়ে যেত অর্থাৎ বিভূতিভূষণকে সমালোচক যদি আরো ব্যাপক পরিবেশে বিচার করতেন, তবে হয়তো এই দিকগুলি নিয়ে আলোচনার এত সুযোগ থাকত না। আমি এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিভূতিভূষণের প্রবন্ধ, বিভূতিভূষণের 'সাহিত্যের কথা' প্রবন্ধ, পথের-পাঁচালী অপরাজিত নিয়ে পরিচয়-বিচিত্রা সংবাদ (এই অংশটি অবশ্য 'পরিচয়'-এ পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে) ইত্যাদি বিস্তৃত তথ্যগুলি পেয়েছি। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে নানা বিষয়ে, যেমন সাহিত্যের উদ্দেশ্য, দেশের উন্নতি, সাহিত্যে নীতি, প্রেম, জীবন,

পরলোক, সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্যের অবসান ইত্যাদি বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ে বিভূতিভূষণের বক্তব্য কি লেখক তা দেখিয়েছেন তাঁর জার্নালে উল্লিখিত নানা ঘটনা ও আবেগের সাহায্যে, তাঁর গল্প-উপন্যাসের নানা চরিত্রের উদাহরণ দ্বারা।

কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একটি গ্রন্থ যখন একজন লেখকের রচনাবলীর বিশ্লেষণের কাজে নিয়োজিত, তখন স্বভাবতই আমাদের দাবি তার ওপর কিছু বেশি। আলোচ্য গ্রন্থটির ভঙ্গি দেখে আমার মনে হয়েছিল, লেখক বুঝি বিভূতিভূষণের প্রায় সমস্ত প্রতিনিধিমূলক রচনারই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন। অন্তত, এ জাতীয় কোনো একজনের—লেখকের রচনা-কেন্দ্রিক আলোচনা তেমনই হয়ে থাকে। কিন্তু পথের পাঁচালী, অপরাজিত ব্যতীত বিভূতিভূষণের আর কোনো রচনার প্রতি সমালোচক ততটা গভীর দৃষ্টিপাত করেন নি। "তাঁর নায়করা নামেই আলাদা—সকল নামের অন্তরালে একটিমাত্র মানুষের পদধ্বনি নিঃসংশয়িতভাবে শোনা যায়—সেই মানুষটার নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।" "একঘেয়ে জীবনে রোমান্সের স্বাদ পেতেন বলে তাঁর সাহিত্যও একঘেয়েমি প্রসূত। বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালী, অপরাজিত—এরপরে নতুন বা গভীরতর কিছু বলতে পারলেন না।"—সমালোচক এ-সকল যুক্তি দিয়েছেন। কথাটা হয়তো অনেকখানিই সত্য। কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রধান চরিত্রগুলি বাদ দিলে অপ্রধান চরিত্রের যে বিচিত্র সমাবেশ—তার রহস্য ভেদ করা উচিত হত। অনুবর্তন ও আদর্শ হিন্দু হোটেল উপন্যাসে লেখকের শিল্পীমন, বা, বলা চলে, লেখকের অপু-মন নিজেকে প্রয়োগ করেছে অনেক ক্ষেত্রে। হাজারি ঠাকুরও প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট। লেখকের এই আত্মপ্রক্ষেপ কিন্তু উপন্যাসের চরিত্রের বাস্তবতার সঙ্গে মিশে যায় নি, (প্রক্ষেপ যখন, মিশে যাবার কথাও নয়), মিশে তো যায়ই নি, এমনকি স্বচ্ছন্দে সেই প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিকে আলাদা করে নেয়া যায়। এই আত্মপ্রক্ষেপটুকু বাদ দিয়ে যে-চরিত্র, তা কি অনেকখানি-পরিমাণ বস্তুগত নয়? আর হাজারি ঠাকুরের কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে, এ উপন্যাসটিতে কত অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র এসেছে, কত অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা এসেছে, —কিন্তু ঔপন্যাসিকের যে-বস্তুজ্ঞান থাকলে প্রায় জীবনেরই মতো বিরাট-জটিল-গভীর শিল্পকর্ম উপন্যাসে এগুলো সমাবিষ্ট হতে পারে, তার পরিচয় এখানে আছে। কিংবা হাজারি ঠাকুরের চরিত্র লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ বিযুক্ত

করে বিচারে কি দাঁড়ায় ? একটি লোক, অতি সাধারণ স্তরের লোক নিজস্ব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, সেই ব্যবসা নিয়ে তার কত গোপন স্বপ্ন, —এত গোপন ও এত স্বপ্ন যেন মনে হয় সেই স্বপ্নের সে প্রেমে পড়েছে। এরই নাম তো বাস্তবতা। বাস্তবচিত্রণ অর্থ কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার নয়, সেই বাস্তবতার সঙ্গে রোম্যান্টিক সম্পর্ক আছে। দেখাতে হবে, সেই বাস্তব কি করে বাস্তব হয়েও—স্বপ্নসম্ভব। হোটেল-প্রতিষ্ঠার জন্য হাজারি ঠাকুরের জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও সফলতা—কত বীরত্বমণ্ডিত, কত মহৎ —এ-যেন সুদীর্ঘ সুতীব্র যন্ত্রণার শেষে একটি কবিতা লেখা বা প্রেমাস্পদাকে লাভ করা। 'ইছামতী' উপন্যাসের ভবানী চরিত্রে এই বস্তুজ্ঞানের পরিচয় নেই। লেখক বিভূতিভূষণ কি করে নিজের দর্শনের ফাঁদে পড়ে বস্তুজ্ঞান হারিয়েছিলেন, তার নজির ইছামতী। দৃষ্টিপ্রদীপেও এ বস্তুজ্ঞান অপেক্ষাকৃত কম। বিপিনের সংসারেও। আরো অনেক উপন্যাসেও। কিন্তু আদর্শ হিন্দু-হোটেল, অনুবর্তন, আরণ্যকে তাঁর এই বস্তুজ্ঞানের প্রমাণ লেখক দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জনবাবু আরণ্যকের জন্য দুটি পাতা ব্যয় করেছেন। এবং পথের পাঁচালী, অপরাজিত ব্যতীত আর কোনো উপন্যাসকেই তিনি এ-মর্যাদা দেন নি। তিনিও আরণ্যক উপন্যাসটিকে অরণ্য ও 'আমি'—এ দুয়ের প্রেমের কাব্য হিসাবে দেখেছেন। অরণ্যের সঙ্গে একটি সভ্য-সংস্কৃত-শিক্ষিত যুবার প্রেমের কাব্য তো বটেই, কিন্তু এখানেই আরণ্যক সম্পূর্ণ নয়। এই অরণ্যকে উচ্ছেদ করছেন নায়ক। যাকে তিনি ভালোবেসেছেন, প্রভাতে-দুপুরে-বিকেলে-নিশীথে প্রাত্যহিক ও বিচিত্র পরিচয়ের মধ্য দিয়ে সে প্রেমের উন্মেষ, তাই সে-প্রেম গভীর, প্রথম-দর্শনে-প্রেমের মতো উপরিতলস্থ নয়, গভীর। এত গভীর যে নায়ককে সেই সদ্যোজাত প্রেমচেতনার মধ্যেই নায়িকার দেহে আঘাত হানতে হয়েছে। মৃত্যুরাজের দূত কোনো সুন্দরীর আত্মা নিতে এসে যদি তাকে ভালোবেসে ফেলে, সে যেমন ভীষণ-নির্মম-মধুর হবে—এ-উপন্যাসে তা আছে। কিন্তু আর একদিকে আছে অসংখ্য সাধারণ মানুষ। তাদের প্রতিও লেখকের মনোভাবে গভীর ভালোবাসা। সে ভালোবাসা সে শিখেছে অরণ্যকে ভালোবেসেই। এবং এটাও সে জেনেছে একটি ভালোবাসাকে হত্যা করতে না পারলে আর একটি ভালোবাসা বাঁচবে না। তবু একটি হত্যার পেছনে যত আপত্তি প্রতিবাদ বিষাদ থাকতে পারে তাও বর্তমান। মঞ্চী-কুন্তী-ভানুমতী-দবরু-পান্না আর অসংখ্য সাধারণ

মানুষের প্রতি লেখকের সহানুভূতিও কোনো অবস্থাতেই অরণ্যর প্রতি তাঁর সহানুভূতি থেকে কম নয়। বিভূতিভূষণ আত্মপ্রক্ষেপ করেছেন, সেখানে তাঁর সীমাবদ্ধতা, তবু বাস্তবতা এসেছে—চরিত্রে-কাহিনীতে, যেমন—অনুবর্তন আদর্শ হিন্দু হোটেল। বিভূতিভূষণ আত্মপ্রক্ষেপ করেছেন, ফলে তাঁর উপন্যাস ব্যর্থ হয়েছে—উদাহরণ ইছামতী, দৃষ্টিপ্রদীপ। বিভূতিভূষণকেই তাঁর সমস্ত উপন্যাসের নায়ক বলে চিহ্নিত করেছেন চিত্তরঞ্জনবাবু—এবং আত্মজীবনী নিয়ে একাধিক উপন্যাস লেখা প্রায়শই সম্ভব নয়—এবং চিত্তরঞ্জনবাবুর মতে বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালী বা অপরাজিতের পরে "নতুন বা গভীরতর কিছু বলতে পারলেন না।" কিন্তু আত্মজীবনী নিয়ে বিভূতিভূষণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রসের ভিন্ন ধাঁচের অন্তত আরো একটি প্রায় সমপরিমাণ সার্থক উপন্যাস লিখেছেন—আরণ্যক।

চিত্তরঞ্জনবাবুর কথাকে (এটি আরো অনেকেরও কথা, এবং আমার আলোচনাতে নিশ্চয়ই এটা বোঝাতে পেরেছি যে, এ-কথায় আমারও আংশিক সম্মতি আছে) ছোটখাটো সূত্রের মতো করে বলতে গেলে দাঁড়ায় যে—বিভূতিভূষণের দার্শনিক মনই তাঁর সীমাবদ্ধতার কারণ, ফলে তিনি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে গভীর ; তার গভীরতা বিস্তৃত নয় এবং তাঁর বিস্তৃতি গভীর নয়।

চিত্তরঞ্জনবাবু তাঁর আলোচনার—গল্প-উপন্যাস প্রবন্ধ-জার্নাল থেকে—নানা উদাহরণ নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছেন। বিভূতিভূষণ বিস্তৃত নন—স্বীকৃত। কিন্তু তাঁর গভীরতায় কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি আছে—পরিমাণে কম হলেও। এবং সে বিস্তৃতি বা গভীরতা মানুষের তৈরি নয়, জীবনের ; এবং শিল্পীর আবিষ্কৃত ; তাই পরিমাণ এখানে বিচার্য নয়।

কিন্তু কেন ? চিত্তরঞ্জনবাবু এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন নি। এ-গ্রন্থে তাঁর রীতি এমন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনেরও নয়। প্রেম, জীবনবোধ, প্রকৃতি-প্রীতি—ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভূতিভূষণের চিন্তা তিনি আমাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন—সে ব্যাখ্যা সর্বদাই তথ্যে নির্ভরযোগ্য, ও সরসতায় হৃদয়গ্রাহী। তবে সিদ্ধান্তের শেষে "কিন্তু কেন ?" প্রশ্নের জবাব খোঁজেন নি। যদি খুঁজতেন তাঁর গ্রন্থের ধরন একটু বদলাত, একটু বিস্তৃত হতে হত, আকারও হয়তো অবশ্যম্ভাবীরূপেই বড় হত—কিন্তু আমরা লাভবান হতাম। এবং চিত্তরঞ্জনবাবুর মতো সৎ নিষ্ঠাবান একাগ্র গবেষক এ-বিষয়ে আমাদের কত

নতুন কথাই না জানাতেন! অপূর্ব-চরিত-মানসে সমালোচক প্রায় সত্তর পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। এই অংশের দুর্গা, অপু-দুর্গার সম্পর্ক, সর্বজয়া-অপু ইত্যাদি অংশগুলি সুলিখিত কিন্তু এ-সকল আলোচনা পূর্বেও আরো অনেক হয়েছে, তার পরিবর্তে শিল্পী-মানসের নেপথ্য-লোকের আলোচনা আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করত।

মনে হয় এই প্রশ্নটির যদি মীমাংসা হয় বিভূতিভূষণের সত্য পরিচয় লাভ অনেক সহজ হত। দার্শনিকতা ঔপন্যাসিকের অতি-আবশ্যক প্রয়োজন। অথচ এই দার্শনিকতাই বিভূতিভূষণের কাল হয়েছে। বস্তুত ঔপন্যাসিকের দার্শনিকতা বিভূতিভূষণের ছিল না—যে দার্শনিকতা বস্তু-জাত ও বস্তু-নিয়ন্ত্রিত। রামায়ণ-মহাভারত-শোনা গ্রাম্য লোকটি যেমন জীবনোর্ধ্ব একটি জগৎ সম্পর্কে মোটা কতকগুলি ধারণায় স্থির থাকে—তার বস্তুবোধ কিছুতেই সেখানে পৌঁছতে পারে না, তার ঐ 'উচ্চ' ধারণাও বস্তুর স্তরে নেমে আসে না—' ঠিক তেমনি জীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণের পরস্পর বিচ্ছিন্ন 'উচ্চ' ধারণা ও খাঁটি বস্তু-জ্ঞান আছে—এবং এই উভয়কেই তিনি শিল্পকর্মে লাগিয়েছেন—অথচ তেলজলের মতো এ দুই কিছুতেই মিশ খেতে পারে না। তাই বিভূতিভূষণের সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী-সুলভ সাফল্যের পাশে পাশেই ছেলেমানুষি। কিন্তু কেন?

পূর্ণ-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে-ভাববাদ পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে ও পরবর্তী ধনতান্ত্রিক বিকাশের কালে যে-ভাববাদের প্রতিরোধী বস্তুবাদের জন্ম সম্ভব, বাংলা দেশের আধা-সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগে তা খণ্ডিত পৌরাণিকতাতেই আটকে রইল। পরবর্তী ইংরেজ যুগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোয় আর ধনতান্ত্রিক প্রভুর আধিপত্যে আর এক জটিল অবস্থা। এর সঙ্গে উনিশ শতকী ধর্ম-আন্দোলন বিশ-শতকী হতাশা, রাজনৈতিক আন্দোলন, নবলব্ধ আন্তর্জাতিকতা, প্রথম মহাযুদ্ধ, ২০-৩০ সালের হতাশা, গান্ধিজীর আন্দোলনে নতুন আশা—এ-সব কিছুর পাশাপাশি সাহিত্যের ইতিহাস বিচার করলে সে প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

বলতে কুণ্ঠা নেই, আমি কিন্তু চিত্তরঞ্জন ঘোষের কাছ থেকে এমনি একটি আলোচনা গ্রন্থ আশা করেছিলাম—যা দেখে আমরা শিখব—কী করে একজন লেখককে দেশ-কালের দ্বারা বিচার করতে হয়। তার পরিবর্তে যা পেলাম, সেই পুস্তক-কেন্দ্রিক আলোচনা, বিশ্লেষণে ও রসাস্বাদনে গভীর ও

মধুর। আশা করব শ্রীযুক্ত ঘোষ আরো সমালোচনার দ্বারা উপন্যাস-সাহিত্যের আলোচনা-গ্রন্থের দারিদ্র্য ঘোচাবেন ও উপন্যাস-বিচার ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেবেন।

পূর্ণেন্দু পত্রীর নামাঙ্কন খুব রুচিসম্মত ও বিশিষ্ট। তবে, পরিশেষে প্রকাশককে একটি নিবেদন: দু শত পৃষ্ঠায় পাইকা হরফে ছাপা বইয়ের দাম পাঁচ টাকা করা কি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে?

দেবেশ রায়

গল্প ॥ অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি. এম. লাইব্রেরী। পাঁচ টাকা॥

সাহিত্য, শিল্প এমন এক মাধ্যম, যে মাধ্যমে আমরা অতি অনায়াসেই আন্তর্জাতিক হতে সক্ষম। ভিনদেশী মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার জোয়ার-ভাঁটা আমাদেরও আন্দোলিত করে মানবিক সম্পর্কের একটি স্বাভাবিক, সাধারণ আবেগে। জাতি, ধর্ম, বর্ণের পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষ মানুষই, একমাত্র মনুষ্যত্বের বন্ধনেই সকল দেশ আমার স্বদেশ, আমরা সবাই এক পরিবারভুক্ত—অন্নদাশঙ্কর এমনই চেতনার একজন সক্রিয় ও অক্লান্ত কর্মী। তাই তাঁর রচনায় দেশ-বিদেশের নানা শহর, গ্রাম, সমুদ্রতীর পটভূমি রূপে স্থান পেয়েছে, বিদেশী হয়েছে নিকট আত্মীয়। অথচ পটভূমির সঙ্গে লেখকের নিবিড় সান্নিধ্য ও সংযোগ উক্ত প্রেক্ষিতের ব্যবহার কদাচ চাতুরীর খেলা বলে প্রতীয়মান হয় না। তার কারণ অন্নদাশঙ্কর সর্বদাই বিবিধ মানবিক সমস্যা সমাধানে উৎসুক, নিরলস পরিশ্রমী, তাই যখন তিনি সমাজ-সংসারের কুসংস্কার, ভীরুতার চিত্র নির্মম রূপে প্রকট করেন, তখনও তাঁর জ্ঞান থাকে যে মানবিক সমস্যা ও চেতনার সংকট নিরূপণে ব্যঙ্গের কশাঘাত সময়-বিশেষে কার্যকরী হলেও আসল প্রয়োজন সহযোগিতা, সহমর্মিতার। ফলে তাঁর উপন্যাস-প্রবাহের মতোই গল্পগুলিতে দুই রচনার সাক্ষাৎ পাই।

'প্রকৃতির পরিহাস' পর্যায়ের গল্পে লেখক অতি-তরল মেজাজে সামাজিক গ্লানি, কুসংস্কারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন। '১৭১ হেনরিয়েটা রোড', 'গাধা-পিটিয়ে ঘোড়া', 'উপযাচিকা', 'স্ত্রীর দিদি', 'স্তনন্ধয়' প্রভৃতি রচনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করেন সামাজিক, মানসিক ও ব্যক্তিক পিছুটান ও ক্লীবত্বকে। যদিও এ কশাঘাত বিষযুক্ত নয়, সিক্ত হয়েছে আশ্চর্য স্নিগ্ধতায়। সেজন্য

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নির্মম চিত্রের অন্তঃস্থলে আবহ সঙ্গীতের মতো ঝঙ্কার দিয়েছে মানবিক সুর। তাই গল্পগুলি এক অভিনব রসে সঞ্জীবিত, যাকে বলা যায় 'ব্যঙ্গরস'। এ রসে বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ জ্বালা নেই, আছে লঘু পরিহাসের সঙ্গে চিন্তার অবকাশ। 'নজর বন্দী' গল্পে যখন লেখক করুণ রসের মধ্যে লঘুতার প্রলেপ লাগান, তখন তা অতি নাটকীয়তায় পর্যবসিত হয় না, বরঞ্চ অতি কারুণ্যের সঙ্গে ব্যঙ্গের আশ্চর্য মিলই প্রমাণ করে। এ-গল্পে পাঠিকার শান্ত স্নিগ্ধ চিত্রের সমান্তরালে মিলিত হয়েছে লেখকের চপল মনোভঙ্গী এবং সমাপ্তিতে নায়িকার বিয়োগান্ত পরিণতির পর যখন লেখক বলেন, "আমি আফিং ধরলুম" তখন তাঁর নিশ্চিন্ত দৃঢ় লেখনীর ক্ষমতা আমাদের অভিভূত করে এবং গল্প পাঠান্তে আমরা লঘু-গুরুর একটি মিলিত দ্যোতনায় বিমূঢ় হই।

অন্যদিকে 'সত্যাসত্য' উপন্যাস রচনাকালীন অন্নদাশঙ্করের মনোভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছেন। সেই সময় স্বীয় রচনা ও নিজেকে নিয়ে নানা পরীক্ষায় নিমজ্জিত হয়েছেন লেখক সমস্যার উৎস-সন্ধানে। 'আগুন নিয়ে খেলা', 'পুতুল নিয়ে খেলা'র পরিহাসমুখর ভঙ্গিমা পরিত্যক্ত হয়ে সংকট ও সমস্যার অনুকূল ভাব ও ভাষা নির্বাচিত হয়েছে। উপন্যাসের এই মনোপরিবর্তন গল্প রচনার ক্ষেত্রে অভিঘাত সৃষ্টি করেছে, যার প্রথম ফসল 'মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না'। 'প্রকৃতির পরিহাস'-এর গল্পগুলির সঙ্গে 'মনপবন' ও 'যৌবন জ্বালা' পর্যায়ের রচনার পার্থক্য লেখকের কথায় ব্যক্ত হয়েছে: "আমার জীবন-দর্শন বদলে যায়। সেই সঙ্গে সাহিত্য-দর্শন। ভাষা ও শৈলী। ইচ্ছা করেই আমি প্লট ও চরিত্র উদ্ভাবন বর্জন করি। ঔজ্জ্বল্য বর্জন করি। সমাজ সংস্কার প্রভৃতি উদ্দেশ্য বর্জন করি। এক একটি গল্প ভূরি পরিমাণ ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।" (ভূমিকা)

'মনপবন' ও 'যৌবন জ্বালা' পর্যায়ে অন্নদাশঙ্কর যেন একটি স্থির ভূমিতে পদস্থাপনা করেছেন। 'মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না', 'দু কান কাটা', 'সবার উপর মানুষ সত্য', 'হাসন সখী' প্রভৃতিতে লেখক জীবনকে নানা প্রতিবেশ ও সমস্যায় স্থাপিত করে একটি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করেছেন, সেই সূত্রটি প্রেমের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা অথচ এ-প্রেম বৈষ্ণব, বাউল ও সহজিয়া মতাদর্শের প্রায় নিকট-আত্মীয় বোধ হলেও অন্নদাশঙ্কর স্বকীয় সাধনায় গল্পগুলির যেখানে ইতি টানেন, সেখানেও অন্য এক সমস্যার সম্মুখীন

করেন পাঠককে অর্থাৎ পাঠক যদি ভাবেন এই ভালো, লেখক দেখাবেন এ-ভালোর পর আর কি ভালো থাকতে পারে অথবা আছে। তাই গল্পগুলির রচনারীতি নূতন—আরম্ভে অতি তুচ্ছ ঘটনা তরলরূপে লিখিত হলেও গল্প শেষে যেন বিস্ফোরণ ঘটে এবং আকস্মিকরূপে আমরা বৃহৎ ও মহতের সাক্ষাৎ পাই। 'সবার উপর মানুষ সত্য' গল্পে "মানুষ বলে যাদের ভালোবাসতুম তাদের একজন ম্যান নয়, ইংলিশম্যান। আরেকজন ম্যান নয়, মুসলম্যান।" বলে যদি শেষ হত তবে আমরা বোকুর অভিমানহত বিক্ষুব্ধ মনের পরিচয় পেতুম, কিন্তু অন্নদাশঙ্কর 'আমার' কথায় গল্প শেষ করেন এই বলে—"সে এখন প্র্যাকটিসে মন দিয়েছে বটে, কিন্তু ভুলতে পারছে না যে মানুষ কোথাও নেই। আছে শুধু ইংলিশম্যান, মুসলম্যান, জারম্যান, জাপম্যান, ব্রাহ্ম্যান। কোন্‌টা বড় ট্র্যাজেডি? মানুষের অন্তর্ধান না মানুষগুলোর মৃত্যু?" গল্পের সমাপ্তিতে আমরা অন্য এক সমস্যার দ্বারে উপনীত হলুম, অথচ এমন সমাপ্তিতে তিনি কোনও সস্তা চটক ব্যবহার করেন না। স্বাভাবিকভাবেই গল্প শেষ হয়।

আবার 'রূপদর্শন', 'নারী', 'অপ্সরা' প্রভৃতি গল্পে মানুষের সৌন্দর্য-চেতনা, সৌন্দর্য-দর্শনের সমস্যাবলীর মূল সন্ধানে অন্নদাশঙ্কর সমান আগ্রহী। রূপ দেহাশ্রিত না দেহাতীত এমন দ্বন্দ্বের চিত্র রচনা করে লেখক পুনরায় এক সমস্যা থেকে অন্য এক সমস্যায় উপনীত করেন পাঠককে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলির কৃতিত্বই এখানে যে লেখক কেবলই পাঠককে অনিসন্ধিৎসু, চেতন ও গভীর করে তোলেন এবং জীবন যে সরল মসৃন নয়—নানা সমস্যা দ্বিধাদ্বন্দ্বে চঞ্চল, এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেন। তবু একটা অভিযোগ স্বতঃই মনে পড়ে গল্পগুলির পাত্র-পাত্রী যেন আমাদের প্রাত্যহিক-জীবনের মানুষ নয়—যেন তারা লেখকের আদর্শ-সৃষ্ট মানবমানবী। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, অন্নদাশঙ্করের গল্প এক অভিনব প্রকরণে লিখিত এবং গল্পগুলিতে গল্পই মুখ্য আকর্ষণ নয়—লেখকের দৃষ্টি মানুষের প্রতি নিবদ্ধ, সেজন্য প্রচলিত মানদণ্ডে গল্পগুলি বিচার করলে, আমরা বিপর্যস্ত ও অপদস্থ হতে বাধ্য হব—অন্নদাশঙ্কর যে উচ্চতানে সুর বাঁধেন, তার সীমায় উপনীত হওয়াই আলোচকের একান্ত কর্তব্য নচেৎ জ্ঞানের অনৌদার্য এবং দারিদ্র্যই প্রকাশিত হবে।

শ্রীমতী লীলা রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদপট একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন এবং প্রচ্ছদপটের জন্য শ্রীমতী রায়ও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

কার্তিক লাহিড়ী

জীবনস্রোত ॥ দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তকালয়। আড়াই টাকা ॥

বাংলা নাটকে হাওয়া বদলের পালা এসেছে। সে হাওয়া বাইরের ঘটনার নয়, ভিতরের অনুভূতির সামগ্রিক বিশ্বাসের। সমাজজীবনের পরিবর্তনের স্পন্দন যদি এতে ধরা পড়ে থাকে তাহলেই আমরা খুশি। আঙ্গিকে, বিন্যাসে এবং বক্তব্যে আজকের নাটক অনেক বেশি ভাবায়, মনকে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। এর কারণ, আমার মনে হয়, আমাদের আবেগের সঙ্গে মিশেছে একটি গভীর জীবনদর্শন যার পূর্তিতে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ফলশ্রুতি। আধুনিক তরুণ নাট্যকাররা যে পথে অগ্রসর হচ্ছেন দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের পূর্বযাত্রী। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাংলা নাটক লিখছেন। এবং তাঁর নাটক একটা বিশেষ চিন্তনের বাহক। সে চিন্তা মানুষের সুস্থতার, সমাজের অপরিহার্য পরিণতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ।

দিগিনবাবুর 'বাস্তুভিটা' 'মোকাবিলা' 'তরঙ্গ' প্রভৃতি নাটকের কথা আমার মনে পড়ছে। যেহেতু বাংলা নাটকের পাঠক নেই, পাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে আমাদের দেশে নাটকের উৎকর্ষ বিচারেরও সুযোগ নেই। প্রযোজনা ও অভিনয়ের উৎকর্ষের সঙ্গে নাটক ও নাট্যকারের বিচার জড়িত হয়ে আছে। তথাপি আমি বলব দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক রচনার পশ্চাতে যে সুস্থ ও সবল একটি দর্শন কাজ করছে সেটাই নাট্যকার হিসাবে তাঁর প্রধান বক্তব্য। নব-নাট্য আন্দোলনে যে সুস্থ চিন্তার জন্য আমরা আগ্রহী এবং যার প্রসারে এই আন্দোলনের সার্থকতা, দিগিনবাবু তার একজন বড় অংশভাগী।

'জীবনস্রোত' নাটকটিও তিনি লিখেছেন একটি বিশেষ তাগিদে। তাগিদটি কীভাবে নাট্যকারকে নাটক রচনার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, ছোট্ট ভূমিকায় তিনি তার আভাস দিয়েছেন। তিনি বলছেন : "আমাদের দেশেও আজ দুটো জীবনদর্শনের প্রত্যক্ষ সংঘাত। অধ্যাত্মবাদ-নির্ভর ভাববাদ ও দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ আজ মুখোমুখী।" নাট্যকার সিদ্ধান্ত করেছেন, "প্রায় ক্ষেত্রেই সমষ্টিগত দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি সংঘাত। কিন্তু ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে সামঞ্জস্য সম্ভব।"

কোনো একটা তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করবার জন্য নাটক রচনায় আমি অনুরক্ত

নই। কারণ, নাটক তত্ত্ব নয়, জীবনের প্রতিরূপ। তত্ত্ব যদি সেখানে কোনো আলোড়ন আনে, তবে তার প্রবেশ হবে চরিত্রনির্ভর ঘটনার অনুষঙ্গী। একথাও ঠিক, ব্রেখট যে-বিষয় বারবার বলতে চেয়েছেন, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই এখন সামগ্রিক মানুষের চরিত্র-মূল্যায়ন। নাটকের আঙ্গিকে এই সামগ্রিক মানুষের গোটা সমস্যাই বিন্যস্ত হবে। নাট্যকার দিগিনবাবু 'জীবনস্রোত' নাটকে একটি বৃহৎ সমস্যা তুলে ধরেছেন, তার একটা সমাধান তিনি দিতে চেয়েছেন সংঘাতে নয়, সামঞ্জস্যে।

বরদা আশ্রমের অধ্যক্ষ তেজসানন্দ, আশ্রমকন্যা গীতা, তরুণ অধ্যাপক জিতেন্দ্র গাঙ্গুলী। এই তিনটি চরিত্রই বর্তমান নাটকের ত্রিধারা। এঁদের পাশাপাশি রয়েছেন জিতেনের বন্ধু উগ্র বস্তুবাদী তাপস দত্ত, তেজসানন্দের শিষ্য অঘোরানন্দ ও মার্কিন মহিলা স্পিরিচুয়ালিস্ট এলিজা। আশ্রয়হীনা উদ্বাস্তু বালিকা গীতা তেজসানন্দের আশ্রমে পালিতা, ধর্মপ্রাণা। জিতেনের প্রতি তার অনুরাগ যেদিন প্রণয়ের রূপ নিল সেদিন তার অন্ধ ধর্মবিশ্বাস আকস্মিক ধাক্কা খেল জিতেনের কাছ থেকেই। জিতেন সংস্কারমুক্ত, পরিচ্ছন্ন বিবেক। অথচ গীতা জিতেনকেই চায় জীবনসঙ্গীরূপে। আশ্রমকে কেন্দ্র করে ভিড় করেছে মার্কিন মহিলা এলিজা, যার আদত উদ্দেশ্য ধর্মের আবরণে মার্কিন জীবনযাত্রার প্রচার ও কমিউনিস্ট-বিরোধিতা, তেজসানন্দের শিষ্য অঘোরানন্দ যার লোভ গীতার ওপর এবং রায়বাহাদুরের মতো ব্যক্তিত্বহীন, সুবিধাবাদী বাচাল অকর্মণ্য মানুষ। তথাকথিত আশ্রমের ভিতরকার চেহারাটি নাট্যকার অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ। যিনি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, মানুষের সেবাকেই যিনি জানেন ধর্ম। তাই তিনি জিতেন গাঙ্গুলীর সম্পর্কে রায়বাহাদুরকে বলছেন, 'অঘোরের মতো আস্তিক না হয়ে নাস্তিক হওয়া বোধ হয় অনেক ভালো।' নাটকীয় ঘটনার বিবর্তনে গীতার সঙ্গে জিতেনের পরিণয়ের মুহূর্তেও স্বামী তেজসানন্দের মুখে নাট্যকার যে কথা যুগিয়েছেন তা বিশেষ অর্থপূর্ণ। তিনি গীতাকে আশীর্বাদ করে বলছেন, 'তোমার ভগবদ্‌ভক্তি দিয়ে যদি একজন নাস্তিকের প্রাণে বিন্দুমাত্র ধর্মভাবও জাগাতে পারো, তবেই বুঝবো আমার শিক্ষা সার্থক হয়েছে। আর তা না হয়ে যদি জিতেন তোমাকে জয় করে, তবে জানবো, এতদিন যে সত্যকে জেনেছি হয়তো তাই শেষ সত্য নয়, তার পরেও সত্য আছে।'

একটা কঠিন বিষয়বস্তু নিয়ে নাট্যকার পরীক্ষা করেছেন। ভাববাদী সংস্কার ও বস্তুবাদী বিজ্ঞানের এই সংঘর্ষকে তিনি কয়েকটি জীবন্ত চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে রূপ দিয়েছেন। এই পরিণতি বাস্তব কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে সম্ভাব্য সত্যই সাহিত্যের প্রতিপাদ্য। হয়তো কেউ বলবেন, আদর্শের সংঘাতে এই সামঞ্জস্য সম্ভব কিনা। নাট্যকার নিজেও সে কথা চিন্তা করেছেন, বুদ্ধি ও হৃদয়ের সংঘর্ষে তিনি হৃদয়কে জয়ী করেছেন, বুদ্ধিকেও বিসর্জন দেন নি। গীতার আত্মসমর্পণ সম্ভবত নতুন সত্যের কাছে পুরাতন সংস্কারের পরাজয়েরই প্রতীক, কিংবা তেজসানন্দের মতো উদারচেতা ধর্মপ্রাণ মানুষের নতুন উপলব্ধির একটি উজ্জ্বল স্মারক। আমি নাট্যকারকে সাধুবাদ দিই তিনি একটি জটিল অথচ দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন। এ জন্য অগ্রযাত্রীর সাধুবাদ তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য।

কৃষ্ণ ধর

পাঠকগোষ্ঠী

‘পরিচয়’ ও সাহিত্যিক দায়িত্বহীনতা

"বুর্জোয়া শ্রেণীভূত লেখক মাত্রই দায়িত্বহীনতার প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছে।"—জাঁ পল সাত্র।
"স্বপ্ন শুধুই সত্য আর সত্য কিছুই নয়।"

গোড়াতেই বলে রাখি, আমি সাহিত্য-সমালোচক নই এবং সমালোচক হিসেবে লিখছি না। আমার বক্তব্যকে একজন ‘পরিচয়’-পাঠকের প্রতিবাদ মাত্র হিসেবে যেন ধরা হয়—এ অনুরোধ গোড়াতেই জানিয়ে রাখছি। যদিও অনেক বিষয়েই অনধিকার-চর্চা আমি করে থাকি, সাহিত্য-সমালোচনা আমি কদাচিৎ করেছি। তা সত্ত্বেও যে পাঠক হিসেবে আমি আজ প্রতিবাদ করতে বসেছি তার কারণ এবারকার শারদীয় সংখ্যায় ছাপা কয়েকটি লেখা আমার অত্যন্ত বিরক্তি, উষ্মা এবং দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। আরও অনেক ‘পরিচয়’-পাঠকেরই হয়েছে বলে জেনেছি। আমি এই আশায় লিখছি যে আমার প্রতিবাদের একাধিক উত্তর ছাপা হবে এবং এই উপায়ে একটা ফলপ্রসূ আলোচনার সূত্রপাত হবে। যাঁরা এ-আলোচনায় আমার প্রতিপক্ষে দাঁড়াবেন তাঁদের প্রতি একটা অনুরোধ জানিয়ে রাখি। তাঁদের আলোচনা যেন যতদূর সম্ভব এমন ভাষায় লেখা হয় যা আমাদের মতো সাধারণ বাঙালী পাঠকদের কাছে সুবোধ্য হয়। তাদের প্রবন্ধ যেন ‘মেটাফিজিক্যাল’ না হয়। প্রবন্ধকেও তাঁরা যেন কবিতার সঙ্গে বিয়ে দিতে না চেষ্টা করেন। কাব্যময় ভাষা, প্রতীকতার ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে অনেক চিন্তাগত অসততা ও অলসতা লুকিয়ে রাখা যায়। তত্ত্বালোচনায় তাদের বর্জন করে চলা বাঞ্ছনীয়।

আমি আমার বক্তব্যকে দুভাগে ভাগ করব। প্রথম অংশে আমি এবার শারদীয় সংখ্যা ‘পরিচয়ে’ প্রকাশিত চারটি লেখা সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করব এবং দ্বিতীয় ভাগে "ছোটগল্পে নূতন রীতি" নামে যে একটা movement (থুড়ি, improvement, শ্রীবিমল করের ইংরেজীতে) শুরু

হয়েছে তার সম্পর্কে আমার কিছু মতামত জানাব। এই দ্বিতীয় ভাগটি অবান্তর বা প্রথমভাগের থেকে বিচ্ছিন্ন বলে যেন মনে করা না হয়, কারণ প্রথমভাগে আলোচিত লেখক চতুষ্টয়ের দুজন সরকারীভাবেই উক্ত movement-এর সঙ্গে জড়িত। প্রথমভাগে আলোচিত লেখক চতুষ্টয়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বা লেখনভঙ্গির অভিন্নতা আমি কল্পনা করছি না, করার দরকারও নেই। তাঁদের একসঙ্গে জড়ো করার একমাত্র হেতু এই যে, একই শারদীয় সংখ্যায় তাঁদের লেখা চারটি বেরিয়েছে যা দেখে আমার মনে প্রতিবাদের স্পৃহা প্রথম জেগে ওঠে। এ লেখা চারটির আলোচনা করার সময়ে দরকার মতো একই লেখকদের অন্য লেখারও উল্লেখ করার স্বাধীনতা নিয়ে রাখছি ; কিন্তু লেখক চতুষ্টয়ের সমগ্র সাহিত্যসাধনার উপর রায় দেওয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার নেই, তেমনি অন্যান্য লেখকদের নূতন বা পুরনো কোন রীতি সম্পর্কেই কিছু বলতে আমি চাই না। নূতন কত রকম রীতিতে ছোটগল্প লেখা হচ্ছে তার মধ্যে কোন্ লেখক কোন্ দলে পড়েন এসব তথ্য আমার সম্যক জানা নেই ; এবং যে নমুনা পরিচয়ের লেখা চারটিতে এবং "ছোটগল্প—নূতন রীতি" নামধারী কাগজটির পাতায় পেয়েছি তা থেকে এ ধরনের কোন গবেষণায় রত হওয়ার প্রেরণাও পাচ্ছি না। অতএব উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে না চাপানোর জন্য কোন রকমের সাধারণ মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট থাকব এবং ইচ্ছাপূর্বকই আলোচনাটি উপরে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখব।

এক

যে-চারটি লেখার আলোচনায় বসেছি তা হল, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ফুলকোটার গল্প" ; শ্রীপ্রদ্যোৎ গুহের "কথা কও" ; শ্রীসত্য গুপ্তের "ঘোলা জল নোনা জল" এবং শ্রীদেবেশ রায়ের "ইচ্ছামতী"।

গোড়াতেই বিরক্তি, উষ্মা এবং দুশ্চিন্তার কথা বলেছি। এবার তার কারণ বর্ণনা করব। বিরক্তির কারণ হল বিশেষ লেখনরীতির ব্যবহারে প্রথমোক্ত লেখকত্রয় যে দুর্বোধ্যতা তাঁদের গল্পে আমদানী করতে সমর্থ হয়েছেন, তা। বিরক্তি উষ্মার জন্ম দেয় যখন দেখা যায় যে, যে-শৈলীর ব্যবহারে এই দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি তার মধ্যে কোন বিষয়গত অনিবার্যতা নেই। অর্থাৎ যে আঙ্গিকের ব্যবহার পাঠকের অসুবিধার কারণ হচ্ছে, তা ব্যবহার না করেও

বিষয়কে প্রকাশ করা যেতে পারত। কিন্তু এ ধরনের আঙ্গিক ব্যবহারের পিছনে যেন লুকিয়ে আছে আরও একটা মনোভাব যা থাকা প্রগতিবাদী যে কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই নিরতিশয় লজ্জার কথা। তা হল দুর্বোধ্যকে দুরূহ মনে করে এক আত্মপ্রসাদ পাওয়ার ভাব। লেখক হিসেবে পাঠকদের থেকে অনেক উপরে নিজেরাই নিজেদের স্থান করে নেওয়ার প্রবণতা। পাঠকদের অজ্ঞ মনে করে তাদের অবজ্ঞা করার স্পর্ধা। উষ্মার স্থানে আসে দুশ্চিন্তা যখন আঙ্গিকের নির্বাচনে লেখকদের সাহিত্যিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে যে সন্দেহ জাগে তা আরও দৃঢ়বদ্ধ হয় তাঁদের বিষয়-নির্বাচনের এবং বিষয়-বর্ণনের দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে ; এবং যখন এই দায়িত্বহীনতাকে আজকের বাংলাদেশে মার্কসবাদী সাহিত্যিকের দায়িত্বের প্রকৃতি ও পরিমাপের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়।

পাঠককে লক্ষ্য করতে অনুরোধ করি যে ভাষা ও শৈলী সম্পর্কে আমার উপরের মন্তব্যগুলি থেকে শ্রীদেবেশ রায়ের গল্পটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দেবেশবাবুর অন্য গল্প সম্বন্ধে যাই-ই হোক না কেন, তাঁর "ইচ্ছামতী" সম্পর্কে আমার এ-ব্যাপারে নালিশ নেই। তাঁর গল্পটির বেলায় বিষয়-নির্বাচন এবং দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত মন্তব্যগুলোই মাত্র প্রযোজ্য হবে।

আলোচনাটা আমি শুরু করব সাহিত্যিকের দায়িত্ব দিয়ে এবং তারপর পর্যায়ক্রমে বিষয়, দৃষ্টিভঙ্গি, আঙ্গিক এবং ভাষার প্রসঙ্গে যাব।

যে কোন সমাজে সাধারণ যে কোন সাহিত্যিকের দায়িত্ব কি, এ-প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন এখানে নেই। বাংলাদেশে ১৯৬০ সালে মার্কসবাদী সাহিত্যিকের দায়িত্ব কি তার আলোচনাই বেশী উপযোগী হবে। এ দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে ডষ্টয়েভস্কি চরিত্রের "যদি ঈশ্বর না থাকেন তাহলে তো সবই অনিষিদ্ধ" এই উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলা চলে, বাংলাদেশে যদি মার্কসবাদ না থাকে তো যে-কোন ব্যভিচারই সেখানে সম্ভব হবে। বাংলার জাতীয় জীবনের মূল্য-সংবর্ধনের এবং মূল্য-সংরক্ষণের সমস্ত দায়িত্বই এক মার্কসবাদের উপর পড়েছে। যে কোন সমাজেরই ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ রক্ষক এবং প্রগতির শ্রেষ্ঠ চালক আজকের দিনে মার্কসবাদ একথা অবশ্য সত্য, কিন্তু মার্কসবাদই যে একমাত্র রক্ষক এবং চালক তা কিন্তু সব দেশ সম্বন্ধে খাটে না। অর্থাৎ এমন অনেক সমাজের কথাই ভাবা যায় যেখানে মানুষ মার্কসবাদের আওতার বাইরে থেকেও শূন্যমূল্য হয়ে যায় নি, যে-সব সমাজের ঐতিহ্যগত মূল্যের মধ্যে এখনও প্রাণ আছে, যে-সব মূল্য এখনও সক্ষম করছে অগণিত

নরনারীকে দৈনিক জীবনে একটা style অর্জন করতে, নৈতিক দিঙ্‌নির্ণয় করতে, জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে। ফরাসী মার্কসবাদী দার্শনিক অঁরি লফ্যাভ্‌ (Henri Lefebvre) আধুনিক জগতে মাত্র তিনটি জীবিত এবং সম্পূর্ণ বিশ্ববীক্ষার (world view) অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তা হল খ্রীষ্টীয় বিশ্ববীক্ষা, যার ব্যাপকতম প্রকাশ ক্যাথলিক বিশ্ববীক্ষায় ; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিশ্ববীক্ষা, লিবারেলিজমের সঙ্গে মূলে যা সংশ্লিষ্ট এবং মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা।

ক্যাথলিক চিন্তা বা লিবারেলিজমের হয়তো কোন প্রগতিগত ভূমিকা আর বাকি নেই কিন্তু মূল্য সংরক্ষণের ক্ষমতা তাদের এখনও নিঃশেষ হয় নি। এই কথা ভুলে যাই বলে আমরা প্রায়ই মনে করে থাকি যে ইউরোপের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সংকট বুঝি আমাদের জীবনের সংকটের চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ। আমরা বলি, বুর্জোয়া সভ্যতা মৃত্যুমুখী। তা খুবই ঠিক। কিন্তু মৃত তো বলি না। মৃত্যুর মুখেও ইউরোপের সমাজে এখনও অনেক মূল্য অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু প্রাক-ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস থেকে পাওয়া কোন মূল্য আমাদের সমাজে আজ প্রায় অবশিষ্ট নেই। ব্রিটিশ যুগে এক জাতীয়তাবাদ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি এদেশে জন্মায় নি। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে প্রায় একটা বিশ্ববীক্ষার স্থানই নিয়েছিল। সামাজিক জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এবং ব্যক্তিগত জীবনেরও অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদ পেরেছিল সাময়িক মূল্যের সৃষ্টি করতে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে জাতীয়তাবাদের মূল্য সংবর্ধক ভূমিকার অবসান হয়েছে। তার জায়গায় নূতন আর কোন ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয় নি। ফলে আমাদের সমাজমানসে এমন কিছুই বাকি নেই যার সাহায্যে মানুষ অর্থপূর্ণভাবে বাঁচতে পারে বা কোন এক বিশেষ দিকে এগিয়ে যেতে পারে। আমাদের সমাজ আজ তাই সম্পূর্ণই শূন্যমূল্য। এখানে হিন্দুধর্মের কথা তুললাম না। হিন্দু world view বলে কোন এক বা একাধিক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি চিহ্নিত করা যায়ও তো তা (বা তারা) ঠিক যে কোন্ সময় থেকে প্রগতির চালকত্ব হারিয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করা চলতে পারে। কিন্তু নারীর সতীত্ব, গুরুজনে শ্রদ্ধা জাতীয় কিছু কিছু মূল্যের সংরক্ষণের কাজ, যা হিন্দুধর্ম বহু শতাব্দী যাবৎ করে এসেছে, সে-ভূমিকাও ১৯৬০ সালের বাংলাদেশে অন্তত শহরগুলিতে আর থাকছে না। দুর্গা প্রতিমার মুখে সিনেমা অভিনেত্রীর

মুখচ্ছবি দেখার আশায় যে নরনারীর দল পূজামণ্ডপে ভিড় জমায়, যে তরুণদল rock-n-roll বাজনা সহ যে প্রতিমা বিসর্জন দিতে নিয়ে যায়, তারা হিন্দুধর্মের কাছ থেকে আর যাই চাক নৈতিক দিগ্‌নির্দেশ আশা করে না। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার আরেক সংকটের দিনে তার ব্যবহারিক ধর্মে যে ব্যভিচারই ঢুকে থাকুক, আজকের দিনে ইউরোপে নাইটক্লাবে যে জিনিস পাওয়া যায় তা গীর্জায় মেলে না। তেমনি, ইউরোপে লিবারেলিজম্‌ও পেরেছে সমাজজীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে তার আদর্শের শুদ্ধতা বজায় রাখতে। ইংল্যাণ্ডের বা ফ্রান্সের কোন অধ্যাপক টাকার জন্য কোনদিন প্রশ্নপত্র বিক্রি করেন নি ছাত্রদের কাছে, কিন্তু আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম inhibition বেশী নেই। অবক্ষয়ের মুখে খেলো গান, সস্তা নাচের সৃষ্টি হরদমই হচ্ছে সে-সব দেশে। কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠ সংগীতকারকে দিয়ে সে গান গাওয়াতে পারবেন না, কোন ব্যালে-ডান্সারকে সে নাচ নেচে টাকা করতে দেখবেন না। শিল্পীর এই শুদ্ধ শিল্পচেতনা এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের উচ্চাঙ্গ নাচ ও গানের শিল্পীদেরও ছিল, কিন্তু চোখের সামনে এই একটা মূল্যকেও গুঁড়িয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। পয়সার জন্য ওস্তাদেরা সিনেমায় নানান রকম গান গাইছেন, পয়সার জন্য সাধক নর্তকেরা বীভৎস synthetic নাচ নাচছেন। ফ্রান্সে ইতালিতে ক্যাথলিক ধর্ম আছে, মার্কসবাদও আছে ; ইংল্যাণ্ডে মার্কসবাদ নেই বটে কিন্তু লিবারেলিজম্ আছে। বাংলাদেশে ক্যাথলিক ধর্মও নেই, লিবারেলিজমও নেই, তাই মার্কসবাদের দায়িত্ব বাংলাদেশে অনেক বেশী, ফ্রান্সে ইতালিতে বা ইংল্যাণ্ডে যতটা তার চেয়ে। কিন্তু মার্কসবাদের প্রভাব আমাদের সমাজে নগণ্য। সমস্ত ভারতবর্ষে বা সমস্ত বাংলাদেশে তো বটেই, মার্কসবাদী রাজনীতির পীঠস্থান কলকাতাতেও একথা সত্য। শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ সংগ্রাম কলকাতায় যতই জবরদস্ত হোক, ভোট-যুদ্ধে মার্কসবাদী পার্টিদের জয়যাত্রা যতই আশার কারণ হোক, কলকাতার সাধারণ লোকের মনে মার্কসবাদের প্রভাব এখনও অতি সামান্য। তেমনি সামান্য বাংলাদেশের (অর্থাৎ কলকাতার) সংস্কৃতি জগতে সেই প্রভাব। এই সামান্যতা নিশ্চয়ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। 'পরিচয়ে'র স্থান বাংলা সংস্কৃতিতে যে কত সংকীর্ণ তা থেকেই এর একটা ভাল আন্দাজ পাওয়া যায়। 'পরিচয়'ই একমাত্র নিয়মিত পত্রিকা যা বাংলাদেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মার্কসবাদের ধ্বজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা জানি যে পাঠক

সমাজে 'পরিচয়ের' প্রচার খুব বেশী নয়। আমরা এও জানি যে লেখক মহলেও 'পরিচয়' কাগজ সম্বন্ধে সহানুভূতির যথেষ্ট অভাব আছে। শূন্যমূল্যতার ঘনীভূত অন্ধকারে, 'পরিচয়' প্রগতির একটি মাত্র দীপশিখা। যে কোন মুহূর্তেই তাও নিভে যেতে পারে।

বাংলাদেশে মার্কসবাদের প্রভাব বাড়ানো খুব সহজ কাজ না হতে পারে। কিন্তু প্রভাব যাতে আর না কমে, অনুজ্জ্বল দীপশিখাটি যেন আরও না কম উজ্জ্বল হয় তার জন্য যত্নবান হওয়া নিশ্চয়ই 'পরিচয়ে'র লেখকদের কর্তব্য।

বলাই বাহুল্য, পরিচয়ের কোন লেখকই সজ্ঞানে বা ইচ্ছাপূর্বক বাংলাদেশে মার্কসবাদের প্রভাব কমাতে যাচ্ছেন না বা যাবেন না। কিন্তু সমস্যাটা হল এই যে পরিচয়ের লেখকদের মধ্যে (তথা অন্য সব মার্কসবাদীদের মধ্যেই) প্রচুর প্রশ্ন ও সন্দেহ জেগেছে নিজেদের পূর্বেকার ধারণা সম্বন্ধে। অনেকগুলো প্রশ্ন যার উত্তর জানা ছিল বলে ধারণা ছিল এই বছর কয় আগে পর্যন্ত, তারা আবার প্রশ্ন হিসেবে ফিরে এসেছে। দেখা গেছে, ঝুটো উত্তর নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম আমরা। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মনে হচ্ছে bath water-এর সঙ্গে babyকেও ফেলে দেওয়ার একটা প্রবণতা এসেছে। মনে হচ্ছে মার্কসবাদীদের নিজেদের মধ্যেই এক জাতের শূন্যমূল্যতা এসেছে। ভাল সুস্থ সাহিত্য চাই বটে কিন্তু কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা সুস্থ তা যেন একেবারেই জানা নেই। সাহিত্যে প্রগতি কাম্য বটে কিন্তু প্রগতি কি সে সম্বন্ধে যেন আগেকার সব ধারণাই বাতিল হয়ে গেছে। সব কিছু নিয়েই যেন গোড়া থেকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। একথা অবশ্যই স্বীকার করি যে নতুন করে সাহিত্যাদর্শ নিয়ে প্রশ্ন তোলার দায়িত্ব, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দায়িত্বও মার্কসবাদী সাহিত্যিকের আছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে মার্কসবাদের আগাগোড়া সব কিছু নিয়েই কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন ওঠে নি। কোন মার্কসবাদীর যদি উঠে থাকে তো তিনি নিশ্চয়ই আর মার্কসবাদী থাকেন নি। সুতরাং এমন কোন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মার্কসবাদী সাহিত্যিক করতে পারেন না যা মার্কসবাদের মৌলিক কোন নীতির বিরোধিতা করে। তাছাড়া যে কোন রকমের আপাত নতুন আবোল-তাবোল প্রচেষ্টাই নিশ্চয়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। যেমন ধরুন বিজ্ঞানে experiment জিনিসটা করলেই হয় না। কোন বিজ্ঞানের কোন এক শাখায় কোন এক বিশেষ চিন্তাধারার অন্তর্বিন্দুতে আরও খানিকটা তথ্য বা তত্ত্বগত অগ্রগতির জন্য ভেবেচিন্তে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়।

বহুদিন আগে যা প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হয়ে গেছে তা নিয়ে কোন কসরত করলে তা এক্সপেরিমেন্ট আখ্যা পায় না, কোন বৈজ্ঞানিক কাগজ তা ছাপেও না। পৃথিবীটা চ্যাপ্টা এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য আন্তরিকভাবে যে ধরনের প্রচেষ্টাই কেউ করুক না কেন, এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে কোন বৈজ্ঞানিক কাগজে তার বর্ণনা স্থান পাবে না। সাহিত্যেও যদি কেউ কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান তো পরীক্ষকের পরিষ্কারভাবে জানা দরকার কোন্ সাহিত্যাদর্শের উপর ভিত্তি করে, তার কোন্ নীতির কোন্ অন্তর্বিন্দুতে তিনি তাঁর পরীক্ষার ক্ষেত্র স্থাপিত করতে চান। কেউ যদি কোন রকম নীতিই না স্বীকার করে একেবারে গোড়া থেকে ছোটগল্প বা কবিতা বা অন্য কিছুকে নিজে থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নূতনভাবে গড়ে তুলতে চান তো বলব এ ধরনের প্রচেষ্টা দায়িত্বহীন ও নীতিহীন, একে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নাম দিয়ে জাতে তোলা যায় না। তাছাড়া এমন যদি কোন সন্দেহের কারণ থাকে যে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সাহিত্যের উন্নতি না হয়ে অবনতিও হতে পারে তো দায়িত্বশীল লেখকের অন্তত উচিত সে ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অতিব্যস্ততা না দেখানো।

যদিও একথা ঠিক যে ভাল সাহিত্য কি, সাহিত্যে প্রগতি কি, সাহিত্যে বাস্তবতা কিভাবে অনুশীলন করা উচিত এসব প্রশ্নের এক কথায় উত্তর নেই এবং তাদের সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের মধ্যেও যথেষ্ট মতানৈক্য এবং ধারণার অস্পষ্টতা রয়েছে, তবু আলোচ্য লেখা চারটির বেলায় তার দরুণ কোন বিশেষ অসুবিধে পেতে হয় না। কারণ মার্কসবাদের মৌলিক কতকগুলি নীতির, যাদের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা প্রশ্নই ওঠে নি, তাদের আলোতেই এই গল্প কয়েকটির মধ্যে প্রকাশিত সাহিত্যিক মনোভাবকে দায়িত্বহীন প্রতিপন্ন করা যায়।

লেখাগুলিকে এতক্ষণ 'লেখা' বলেই বর্ণনা করেছি। এদের মধ্যে শ্রীদেবেশ রায়ের লেখাটিকে ছোটগল্প হিসেবে আমি চিনতে পারি। অন্য তিনটিকে তাদের লেখকেরা কি মনে করেন তা জানার কৌতূহল রইল। ছোটগল্প বলতে এতদিন যা জানতাম তা এ নয়। কিন্তু এরা ছোটগল্প নয় তা বলব কোন সাহসে? কোন একটা ধরাবাঁধা গণ্ডীর মধ্যে কি বাস্তবের কোন অংশকে বাঁধা যায়? বাস্তব কি সতত পরিবর্তনশীল নয়? সবই পরিবর্তনশীল বটে, কিন্তু তাও তো সংজ্ঞার ব্যবহার চলে সবক্ষেত্রেই। মৌলিক কয়েকটি

লক্ষণের উপর ভিত্তি করে সংজ্ঞার আরোপ ও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন মৌলিক লক্ষণ না মানলে, বিভিন্ন সাহিত্যিক ফর্মের মধ্যে ভেদ না টানলে তো কোন নাম ব্যবহারই সম্ভব নয়। হজবরল-র এক চরিত্র জানায়, তার নাম বিস্কুট, তার বাবার নামও বিস্কুট, তার ভাইয়ের নামও বিস্কুট ইত্যাদি। এ যে সে-অবস্থা দাঁড়াবে! ধরুন একজন নাট্যকার একস্‌পেরিমেন্ট করতে বসলেন নাটক নিয়ে এবং পরীক্ষার ফল হল এমন একটা জিনিস যাতে কোন সংলাপই নেই। তাকেও যদি তিনি নাটক বলতে চান তো তাঁকে ঠেকাবে কে? সাহিত্যে শাসন কে-ই বা পছন্দ করে? তবে এ লেখাগুলি আমার নিজের লেখা হলে আমি তাদের ছোটগল্প বা অন্য কিছু না বলে বলতাম ধাঁধা। কিন্তু নামের সমস্যাটা না হয় আপাতত মুলতুবিই থাক। এদের "লেখা" বলেই উল্লেখ করা চলুক। লেখাগুলির বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গি, শৈলী এবং ভাষা ব্যবহার এবার এক এক করে দেখা যাক।

প্রথমেই মুশ্‌কিলে পড়ে গেলাম। বিষয়গুলো যে কি তা এক দেবেশবাবুর গল্পটি ছাড়া অন্য কোনটির বেলায় পরিষ্কারভাবে বুঝতেই পারলাম না। দেবেশবাবুর গল্পে দুটি চরিত্র, উমা ও দীপক। যে সন্ধ্যায় তারা শিয়ালদা স্টেশনে পরস্পরকে বিয়ে করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় সেই সন্ধ্যার কয়েক ঘণ্টার বিবরণ। সত্যবাবুর লেখাটির নায়ক অচিন্ত্য নামক এক যুবক, সম্প্রতি যার মা মারা গেছে এবং যে বেকার, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাকে তার দাদা-বৌদির উপর নির্ভর করতে হয় এবং তার জন্য গ্লানি বোধ করতে হয়। তার চেতনা-প্রবাহের বর্ণনা ছাড়া ঘটনা বলতে ঘটে অচিন্ত্যের একটা স্বপ্ন দেখা এবং স্মিতা নাম্নী কোন মেয়েকে বাস্তবে বা স্বপ্নে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে তার হাত থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট উড়ে যাওয়া। যে নোটটা তার দরকার ছিল একটা চাকরির দরখাস্ত দেওয়ার জন্য। এর বেশী কিন্তু বোঝা যায় না, যদিও অনেক বাংলা শব্দ অনেক রকম ভাবেই লেখাটির মধ্যে সাজানো আছে। প্রদ্যোৎবাবুর লেখাটি আগাগোড়াই কোন একজন লোকের প্রলাপ বলে মনে হয়। প্রলাপের মধ্যে দিয়ে তার মেয়ে বা অন্য কেউ যাকে সে মা বলে ডাকছে তার সম্বন্ধে তার একটা গভীর অপরাধবোধ প্রকাশ পাচ্ছে। মেয়েটা মনে হয় মরে গেছে। কারণ তার মৃত চোখের দৃষ্টি তাকে বিদ্ধ করছে এমন একটা কথা বারবার প্রলাপের মধ্যেও বোঝা যাচ্ছে। মেয়েটির মারফত কোন উপায়ে টাকা আয় করাটাই মনে হচ্ছে অপরাধবোধের উৎস।

সভ্যতার প্রাচীনতম যে মেয়েদের পেশা তারই কথা হচ্ছে কি না বোঝা যায় না, তবে এমন হালফ্যাসানের লেখায় প্রদ্যোৎবাবু অত মামুলি জিনিস ঢোকাবেন বিশ্বাস হচ্ছে না। এছাড়া কোন জল্লাদরা যেন প্রলাপী ব্যক্তিটিকে তক্তার সঙ্গে পেরেক এঁটে রাখছে (যাতে পঙ্গু হওয়ার প্রতীকী প্রকাশ নাকি? তাহলে জল্লাদরা কারা?), আর কিছু নরমাংসভোজী যেন কোথা থেকে এসে সে-মেয়েটির পায়ের নিচে আগুন জেলে তার চতুর্দিকে আদিম বন্য নৃত্যে মেতে ওঠে। (যৌন লালসাকে জঠরের লালসা হিসেবে অনুবাদ করেছেন নাকি প্রদ্যোৎবাবু?) এমন আরও অনেক কিছু আছে। দীপেনবাবুর গল্পটিতে ঘটনাও যেমন কিছু নেই, চেতনাপ্রবাহও বড় একটা নেই। কি আছে তা বলা শক্ত। কোন একটি নাম না-জানা দেশে গল্পটির শুরু, তার পার্শ্ববর্তী অন্য একটি দেশে তার শেষ। দেশ দুটো সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকু জানি যে তাদের মধ্যে দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। গল্পের একজন নায়িকা আছেন। তিনি একজন বীর রমণী। তাঁকে নিয়ে বই লেখা হয়, গান লেখা হয়, তাঁর নাম গাঁয়ে গাঁয়ে মন্ত্রের কাজ করে। তাঁর এক যুবক স্বামী আছে, তিনিও একজন বীরপুরুষ। আইন এ দুজনের শত্রু। নায়িকাটিকে বন্দী করে সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর অকথ্য শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে তাঁকে পঙ্গু করে দেয়। পঙ্গু দশা থেকে তিনি ধীরে ধীরে আপেক্ষিক সুস্থতায় ফিরে আসেন; তিনি নূতনভাবে জীবনে প্রবেশ করে কি-ভাবে পয়সা রোজগার করবেন, কি-ভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন তা নিয়ে চিন্তিত হন। ইতিমধ্যে অন্য একটি যুবকের কথা বলা হয়। তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, সে যে বেকার এবং সে যে স্বপ্ন দেখে এ ছাড়া। শেষ পর্যন্ত যুবকটি বিয়ে করে। তার আগে তার একটা স্বপ্নের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

এই আকারহীন অস্পষ্ট বিষয়গুলির নির্বাচনে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তাকে কি মার্কসবাদ-সম্মত বলা চলে? না, কারণ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির দুটো মূলনীতি এতে লঙ্ঘিত হয়েছে। এক হচ্ছে মানুষকে বাস্তব জগতের কেন্দ্র হিসেবে দেখা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে মানুষকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করে দেখা। দেবেশবাবুর গল্পের নায়ক মানুষ, তারা ইতিহাসের ঠিক কোন্ অংশের অন্তর্ভুক্ত তাও মোটামুটি বোঝা যায়। কিন্তু সত্যবাবু এবং প্রদ্যোৎবাবুর গল্পের নায়কেরা মানুষ নয়। একক্ষেত্রে তা হল একটা শূন্যে ভাসমান নিরবলম্ব দেহহীন প্রলাপ। অন্যক্ষেত্রে তা হল কোন এক যুবকের

বেকারত্ব ও তজ্জনিত গ্লানির abstract নির্যাস। দীপেনবাবুর লেখায় কোন বিষয় আছে বলেই মনে হয় না। মনে হয় কোন বীর রমণী সম্পর্কিত কোন সত্য বিবরণকে ধাঁধার ভাষায় বিবৃত করা হয়েছে মাত্র। এ তিনটি লেখার কোনটিতেই জীবিত মানুষ চরিত্র নেই। যা আছে তা হল Shaw কল্পিত vortex মাত্র—চিন্তাস্রোত ও অনুভূতির কুণ্ডলী। Shaw কল্পনা করেছেন বিবর্তনের স্রোতে ভেসে একদিন মানুষ এমন এক অবস্থায় উপনীত হবে যখন তার আর শরীরের প্রয়োজন থাকবে না, তার চিন্তা ও অনুভূতিটুকু মাত্র বাকি থাকবে। বাংলাদেশে কি এখনই সে যুগ এসে গেল নাকি? মানুষ যেমন নেই তেমনি ইতিহাসও নেই। ইতিহাস থাকা মানেই স্থান-কাল-পাত্র থাকা। কিন্তু লেখাগুলিতে কে, কি, কেন, কবে, কোথায়—এই পঞ্চ পরিচয়ের কোনটিরই হদিস মেলে না। Aldous Huxley-র মতে মানবিক সব রকম সমস্যার মূল কারণই রয়েছে কালের যাত্রার মধ্যে। যদি becoming না থাকত, যদি শুধু being সম্ভব হত! তাই তিনি দাবি জানান, Time Must Have a Stop। পরিচয়ের কিছু লেখক time-এর চলা বন্ধ করতে পেরেছেন জেনে তিনি নিশ্চয় খুশি হবেন। প্রদ্যোৎবাবুর লেখায় কে প্রলাপ বকছে, কেন বকছে, কি বিষয়ে বকছে কিছুই বুঝবার উপায় নেই। তেমনি অচিন্ত্য কে, কি তার সমস্যা, কি তার সম্পর্ক সুস্মিতার সঙ্গে, ইত্যাদি কিছুই আমরা জানি না। দীপেনবাবু কোন্ দেশের কথা বলছেন, কোন্ রাষ্ট্র, কোন্ সরকার, কোন্ সংগ্রামের কথা বলছেন কিছুই বুঝতে না দিতে যত্নবান। রূপকথার দেশে ইতিহাস থাকে না। সময় হয়তো যায়, অসুস্থ মেয়েমানুষ হয়তো সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু সেখানে ইতিহাস বলে কিছু থাকে না। দীপেনবাবুর লেখাতেও তা নেই।

উপরন্তু, প্রদ্যোৎবাবু এবং সত্যবাবুর লেখায় অপরাধবোধ এবং গ্লানি সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে মার্কসবাদ-বিরোধী। তার কারণ তাঁরা মানুষকে analytical man হিসেবে দেখছেন, যে ধারণা বুর্জোয়া individualist দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণভাবে সব ব্যাপারে analytical হওয়ার প্রবণতায় জাত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে, তার মূল সূত্রই হল, "if everything else remains constant"। প্রদ্যোৎবাবু এবং সত্যবাবুও বলছেন, আর সব কিছু ভুলে যাও, শুধু অপরাধ-বোধটাকে দেখ, শুধু গ্লানিটাকে দেখ। কিন্তু মার্কসবাদ এ-রকমভাবে সব

কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন কিছু দেখায় আস্থাশীল নয়। মার্কসবাদ বাস্তবকে totally দেখে, মানুষ সম্বন্ধে তার ধারণা total man-এর। মানুষকে বুঝতে হলে তার সবটুকু একসঙ্গে দেখতে হবে, আর তার সবটুকু দেখতে হলে তাকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। চলমান সমাজ-জীবনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় দেখতে হবে।

মার্কসবাদ যে বাস্তবকে সব সময়েই ইতিহাস হিসেবে দেখে শুধু তাই নয়, ইতিহাসের ধারায় প্রগতির অস্তিত্বও সে আবিষ্কার করে। অতএব মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাস্তবের কোন চিত্র আঁকা হলে তাকে ইতিহাসের অংশভূত তো হতে হবেই, ইতিহাসের অন্তঃস্থিত প্রগতির চিহ্নও তাতে ফোটাতে হবে। কি ভাবে তা করা যেতে পারে? পরিচয়ে ছাপা অনেক গল্প পড়ে মনে হয়, তাদের লেখকদের মতে নায়ক-নায়িকারা যদি গরিব হয়, চাষাভুষো শ্রমিক বা বেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হয়, যদি কলকাতার রাস্তায় বামপন্থী মিছিলের বর্ণনা থাকে, পুলিশের অত্যাচার যদি নিন্দিত হয়, জোতদার ও কারখানার মালিকদের যদি কালো রঙে আঁকা হয় তাহলেই বুঝি প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রগতি কথাটার মধ্যে গতির উপরেই ঝোঁকটা বেশী। এবং গতি বলতেই একটা দিক বোঝায়। অতএব প্রগতি সাহিত্যে আর কিছু থাক না থাক, কোন একটা বিশেষ দিকে কোন গতিকে দেখান যদি নাও হয় তো, তবু অন্তত নানান দিকের চেয়ে কোন একটা বিশেষ দিকেই যে প্রকৃষ্ট গতি সম্ভব এ বিশ্বাসটা তাতে স্পষ্ট থাকতে হবে। সমস্যা মাত্রেরই সমাধান আছে; সমাধানের পন্থা বুদ্ধির প্রয়োগে খুঁজে বার করা সম্ভব এবং সে-সমাধানকে আয়ত্তে আনতে হলে সংগ্রাম করতে হতে পারে। সংগ্রামে জয়ের সম্ভাবনা কখনও অনুপস্থিত নয়। পরাজয় নিশ্চিত কখনও নয়। এই বিশ্বাসটি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে কেন্দ্রস্থানীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা যদি করা হয় কোন সাহিত্যসৃষ্টিতে তো সে-সাহিত্যকে মার্কসবাদের আদর্শচ্যুত বলতে বাধ্য হব। সে-সাহিত্যে যদি উপরন্তু উদ্দেশ্যহীন ও দিগ্‌ভ্রান্ত নায়কচরিত্রকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখান হয় তার ব্যবহারে যুক্তির চেয়ে অবচেতন মনের ক্রিয়াকে অধিক বলশালী করে দেখান হয়, স্বপ্নের ব্যবহার যদি এমনভাবে করা হয় যা থেকে মনে হয় বাস্তবের চেয়ে স্বপ্নই বেশী সত্য, কোন সমস্যা যদি দেখান হয় কিন্তু সমস্যার যে সমাধান সম্ভব তার যদি আভাস না দেওয়া হয়, যন্ত্রণার প্রতিকার সম্ভব এ বিশ্বাসের কোন

ইঙ্গিত না দিয়ে যদি যন্ত্রণার ছবি আঁকা হয় তো বলব সে রকম সাহিত্য প্রগতি সাহিত্য আখ্যা পেতে পারে না। ইউরোপের অবক্ষয়ী সাহিত্যে জীবনের অর্থহীনতা, উদ্দেশ্যহীনতা, নীতিবাদের অসম্ভাব্যতা, চেতন মনের তুলনায় অবচেতন মনের অধিকতর প্রভাব ইত্যাদিকেই la condition humaine-এর অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হিসেবে ফলাও করে দেখান হচ্ছে। সমজাতীয় যদি কোন মনোভাব কোন মার্কসবাদী লেখকের লেখায় প্রকাশ পায় তো বলতে হবে তিনি আর মার্কসবাদে বিশ্বাসী নন। এমন অবশ্যই হতে পারে যে কোন মার্কসবাদী লেখক এমন কোন বিশেষ জীবনসমস্যার আলোচনা করতে চান যার কোন সমাধান তিনি নিজে খুঁজে পান না, অথবা এক বিশেষ অবস্থায় জীবন তাঁর নিজের কাছে অর্থহীন মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি যদি তাঁর চিন্তার সততার নামে তাঁর লেখায় জীবনের অর্থহীনতা বা বুদ্ধির অক্ষমতা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন প্রকাশ করেন তো বলব তাঁর সাহিত্য প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে।

এই প্রগতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখাকটি সম্বন্ধে কি বলা যায়? দেবেশবাবু ছাড়া অন্য তিনজনের লেখায় যেহেতু মানুষ চরিত্র কিছু নেই এবং ইতিহাসও নেই, অতএব এদিক থেকে তাদের সম্বন্ধে বলারও কিছু নেই। দেবেশবাবুর গল্পটা সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গটা খানিক আলোচনা করা যায়। দেবেশবাবুর গল্পটা পড়তে ভালই লাগে। একটা হতভাগ্যের গানের সুর এতে আছে। উমা এবং দীপকের সম্পূর্ণ আশাহীনতার মধ্যে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্যে লেখকের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে চালচুলোহীন চালির (The Modern Times ছবিতে) পথের ভিখিরি একটা মেয়েকে সাথী করে পথে বেরিয়ে যাওয়ার ছায়া পড়েছে। কিন্তু এ ভাল-লাগা একটা হতাশ বিলাস বিশেষ। অবক্ষয়ী ইউরোপীয় সাহিত্যে আশাহীনতার দশাটাকেই আমেজ করে উপভোগ করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পরিচয়ের অন্য অনেক লেখার মতো দেবেশবাবুর "ইচ্ছামতী" গল্পের মধ্যেও এই প্রবণতা স্পষ্ট। দীপেনবাবুর "চর্যাপদের হরিণীর" নায়ক সুধাময়ের মতো, দেবেশবাবুর "গোপাল ও কলকাতা"র গোপালের মতো দীপকও বেকার এবং বেকারত্ব দশাটুকুকেই তামাক করে অলসভাবে সেবন করে আনন্দ পায়। তাদের আর্থিক ও সাংসারিক অবস্থা যে কতটা জটিল ও হতাশাজনক তা খুব ভালভাবে আঁকা হয়েছে। কিন্তু এ অবস্থাকে আঁকা হয়েছে condition হিসেবে, নায়কদের

দেখান হয়েছে এই condition দ্বারা সম্পূর্ণভাবে conditioned হিসেবে। মনে হয় এই লেখকদের উদ্দেশ্য, একজন লোককে সম্পূর্ণ হতাশাজনক অবস্থায় ফেলে দিলে তার চিন্তা ও ব্যবহার কি রকম হয় তা দেখানো। কিন্তু সম্পূর্ণ হতাশাজনক অবস্থাটা কি জিনিস? মার্কসবাদ এ-রকম কোন অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এমন কোন অবস্থা থাকতে পারে না যেখানে প্রচেষ্টা অসম্ভব বা সংগ্রাম অসম্ভব। কিন্তু প্রচেষ্টা বা সংগ্রামের সম্ভাবনার ছায়াও দীপকের (বা সুধাময়ের বা গোপালের) মধ্যে নেই। তাদের দারিদ্র্য, তাদের বেকারত্ব তাদের কাছে একটি অনড় অটল ভবিতব্যতা, একটা "condition humaine" হিসেবে প্রতীয়মান হয়। দারিদ্র্য বা বেকারত্ব যে একটা সামাজিক সমস্যা, এ সমস্যার যে একটা কার্যকারণ আছে, এ সমস্যার যে প্রতিবিধান সম্ভব এ ধরনের কোন চিন্তা এ জাতের নায়কের মনে স্থানও পায় না। তার কারণ এরা কখনও গুছিয়ে চিন্তাই করে না। এদের মন চেতনাপ্রবাহে ভেসে চলে মাত্র। এরা প্রচুর দিবাস্বপ্ন দেখে (সে-সব স্বপ্নকে, সে-সব এলোমেলো চিন্তাস্রোতকে ফলাও করে বর্ণনা করা হয়)। সমাজজীবনের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্কই নেই। সমাজে এরাই যেন একমাত্র দরিদ্র, একমাত্র বেকার। কলকাতা এদের কাছে একটা বিপক্ষ শক্তি হিসেবে প্রতীয়মান। এরা উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, নীতিহীন। গোপাল চাকরি যাওয়ায় আত্মহত্যা করতে মনস্থির করে; কিন্তু তাও একটা উদ্দেশ্যে পরিণত হয় না। আত্মহত্যা করার ব্যাপারেও সে তার বুদ্ধিবৃত্তি খাটিয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে দৃঢ় পদক্ষেপে এগোয় না। অলসভাবে খামখেয়ালের স্রোতে ভেসে এলোমেলোভাবে এগিয়ে চলে, শেষ পর্যন্ত সে মরে বটে কিন্তু তা অপঘাতে, এবং মরার ঠিক আগে সে আর মরার অর্থ খুঁজে পায় না। দীপক উমাকে বিয়ে করতে রাজি হয় বটে কিন্তু তাও একটা সিদ্ধান্ত নয়, কারণ সে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত নয়। এ একটা casual ক্ষণিক মনোভাব। পরমুহূর্তেই তা বদলে যেতে পারে। দীপক তার অবস্থাকে বুঝতে চেষ্টা করে না, বুঝে তার মধ্যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে না। কোন অবস্থাই তার পরিবর্তিত হয় না। তার অন্য পাঁচটা খেয়ালের মতো (যেমন, চৌরঙ্গীতে না গিয়ে শিয়ালদা যাওয়ার খেয়াল) খেয়াল হয়, বিয়ে না করে থাকার চেয়ে বিয়ে করে ফেললেই বা মন্দ কি?

সুধাময় দীপক গোপালের মতো এ ধরনের সমাজ-সম্পর্কহীন, আশাহীন,

উদ্যমহীন, নীতিহীন, কেবলমাত্র দিবাস্বপ্ন দেখা নায়কেদের কোথা থেকে আমদানী করা হল বাংলা সাহিত্যে? বাংলাদেশের পথঘাট থেকে নিশ্চয়ই নয়। এসব হল ইউরোপের অবক্ষয়ী সাহিত্যের outsiders। Kafka থেকে খানিকটা নিয়ে, Gide এর থেকে খানিকটা নিয়ে তাতে Camus-এর থেকে খানিকটা জুড়ে, পরিশেষে সার্ত্রের উপন্যাসের পথভ্রান্ত নায়কচরিত্রের খানিকটা মিশিয়ে এদের তৈরি করা হয়েছে। 'পরিচয়' কাগজেও যে এরা জাঁকিয়ে বসবে তা দেখে খানিকটা আশ্চর্য হতে হয় বইকি!

এবার আঙ্গিকের প্রসঙ্গে আসা যাক। আঙ্গিকের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিচয়ের অন্তত একজন লেখকের অদ্ভুত ধারণা আছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ একটি প্রবন্ধে শ্রীদেবেশ রায় প্রশ্ন করেন, "যদি বিষয়ের ক্ষেত্রে নূতনত্ব না থাকে দুঃখ হবে, কিন্তু তাই বলে ফর্মের জন্য প্রাপ্য কৃতিত্ব হ্রাস করা যাবে কি?" বিষয়ের মধ্যে কোন নূতনত্ব না থাকলে আঙ্গিকে নূতনত্বের জন্য যে কোন কৃতিত্বই প্রাপ্য হতে পারে না তাও কি বলে দিতে হবে? আঙ্গিকের ভূমিকা কি শিল্পে? বিষয়কে প্রকাশিত করা। বিষয়ের প্রকাশের সবচেয়ে বেশী সহায়তা করে যে আঙ্গিক একমাত্র তারই ব্যবহার সাচ্চা আঙ্গিকের ব্যবহার। বিষয়ের যথোপযুক্ত আঙ্গিককে যদি শিল্পী খুঁজে না পান এবং তার জন্য যদি তিনি তাঁর বিষয়কে ভালভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম না হন, তো তার জন্য তিনি নিজেই দায়ী। কিন্তু এমন যদি হয় যে তাঁর বিষয় নূতন এবং নূতন বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য এক নূতন আঙ্গিক তাঁকে ব্যবহার করতে হয়, তো সে নূতত্বের দরুণ তাঁর সৃষ্টি অন্যের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে, কিন্তু সে দুর্বোধ্যতার জন্য শিল্পী দায়ী নন। এ দুর্বোধ্যতাকে বাদ দিয়ে চলতে চাইলে শিল্পে অগ্রগতিই সম্ভব হবে না। শিল্পে আধুনিকতা, তা গদ্যে হোক বা পদ্যেই হোক, ছবিতেই হোক বা ভাস্কর্যেই হোক—তার সঙ্গে দুর্বোধ্যতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায় তার কারণই এই। কিন্তু এ জাতের সাচ্চা দুর্বোধ্যতা যেমন আছে, তার পাশে মেকী দুর্বোধ্যতাও আছে। মেকী বা ঝুটো দুর্বোধ্যতা তাকেই বলছি যেখানে নূতন বিষয়ের দরকারে নূতন আঙ্গিকের ব্যবহার করা হয় নি। শুধু কৃতিত্ব দেখানোর জন্য, শস্তা গৌরব অর্জন করার জন্য, এমন এক আঙ্গিক ব্যবহার করা হয়েছে যা বিষয়ের প্রকাশে সাহায্য তো করেই না, বরং বিষয়ের দৈন্যকে উপর চাকচিক্যের আড়ালে লুকিয়ে রাখে মাত্র। সাচ্চা দুর্বোধ্যতা সাময়িক।

আজ যে বিষয় নূতন, কাল তা নূতন থাকবে না। তাই যে ভ্যান গগ্ জীবনে একটাও ছবি বিক্রি করতে পারেন নি শ্রেষ্ঠ শিল্প-সমঝদারদের কেন্দ্র পারী শহরে, তার ছবি আজ বালিগঞ্জে বাড়িতে বাড়িতে দেওয়ালে টাঙানো। সাচ্চা শিল্পীর কাছে তাঁর শিল্পের দুর্বোধ্যতা দুঃখের কারণ বিশেষ। তিনি যা প্রকাশ করতে চাইছেন তা অন্য লোকে বুঝতে না পেরে তাঁকে গাল দিচ্ছে বা উপহাস করছে বা খামাখা শ্রদ্ধা করছে, এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? কিন্তু ঝুটো শিল্পীর কাছে তার ঝুটো দুর্বোধ্যতা আত্মপ্রসাদের কারণ হয়। এ দুর্বোধ্যতা যে কোনদিন অনায়াসবোধ্যতায় পরিণত হবে এমন কোন সম্ভাবনা নেই। ইতিহাসের পথের পাশে তা পড়ে থাকবে। ইতিমধ্যে কিছু সাধারণ পাঠক (বা দর্শক বা শ্রোতা) যদি দুর্বোধ্যতাকে গভীরতার লক্ষণ মনে করে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে তো মন্দ কি!

এবার দেখা যাক পরিচয়ের লেখা তিনটির (দেবেশবাবুর গল্পটি বাদ দিয়ে) দুর্বোধ্যতা সাচ্চা না ঝুটো। তার আগে লক্ষ্য করে রাখা যাক যে, যে-আঙ্গিক লেখাগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে তাদের খুব আনকোরা নতুন বলে যেন মনে হয় না। শ্রীসত্য গুপ্তের ভাষায় এদের দেখে যেন মনে হয়, "চেনা চেনা অচেনা"। কিছুটা surrealism, তার সঙ্গে খানিকটা expressionism কাম্যু জাতীয় existentialist লেখনভঙ্গির এক চিমটে, symbolism-এরও খানিকটা, এদের সকলকে stream of consciousness-এর সঙ্গে ভালভাবে মাখিয়ে কড়ায় চাপিয়ে রান্না করে দিলে এ-ধরনের জিনিস পাওয়া যায় বলে মনে হচ্ছে। তরকারিগুলো হয়তো অচেনা, কিন্তু উপাদানগুলো চেনা-চেনা। অবশ্যই অনুপাতের হেরফের আছে, রাঁধুনীর হাতের গুণ আছে, তাই দীপেনবাবুর লেখা এবং প্রদ্যোৎবাবুর লেখার মধ্যে প্রভেদ যে ডাল্না এবং চচ্চড়ির মধ্যে প্রভেদের মতই গুরুত্বপূর্ণ, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু কুলপঞ্জিকা নিয়ে না হয় গবেষণা নাই করলাম। জাতকুল নিয়ে আলোচনায় ভুল করার সম্ভাবনা প্রচুর থাকে, বিশেষ কোন লাভও পাওয়া যায় না তা থেকে। সে-আলোচনা বাদ দিয়ে ব্যবহৃত আঙ্গিকের সার্থকতার দিকে নজর দেওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

আঙ্গিকের ব্যবহার কি সার্থক হয়েছে লেখা তিনটিতে? বিষয়ের দিক থেকে হয় নি, হতে পারে না, কারণ বিষয় বলতে লেখা তিনটিতে সত্যি কিছু নেই। কিন্তু লেখকদের উদ্দেশ্যের দিক থেকে বোধ হয় হয়েছে কারণ বিষয়

যে কিছুই নেই এ সত্যটাকে ঢেকে রাখাই মনে হয় লেখকদের উদ্দেশ্য। এই কারণে লেখাগুলোকে ইচ্ছে করে লিখতে হয়েছে ধাঁধার ধাঁচে। লেখা তিনটি ছোটগল্পের সঙ্গে কবিতার বিয়ে নয়। এরা হল ছোটগল্পের সঙ্গে ধাঁধার বিয়ে। ধাঁধা আর গণিতের সমস্যার মধ্যে প্রভেদ এই যে গণিতের সমস্যার একটাই সমাধান থাকে এবং তাকে সঠিকভাবে প্রমাণও করা যায়। ধাঁধা যিনি তৈরি করেন তাঁর মনে হয়তো একটিই সমাধান থাকে। এ গল্প তিনটিও ধাঁধা। এদের অর্থভেদ করতে হলে যে চাবিকাঠি লাগে তা যুক্তিনির্ভর বুদ্ধির দ্বারা তৈরি করে নেওয়া যায় না, তাকে লেখকের কাছে থেকে ধার করে আনতে হয়। পাঠক নিজের চেষ্টায় বুঝতে চেষ্টা করলে কিছু না কিছু মানে করে উঠতে পারেন কিন্তু সে মানের সঙ্গে লেখকের লুকিয়ে-রাখা মানের মধ্যে কোন সম্পর্ক না থাকারই সম্ভাবনা বেশী। ধাঁধা কথাটা ব্যবহার করার পর আর নিশ্চয় নতুন করে বলতে হবে না যে আমার মতে এ লেখাগুলির দুর্বোধ্যতা পুরোপুরিই ঝুটো। দুবোধ্যতা সৃষ্টি করাই এ লেখাগুলিতে ব্যবহৃত রচনারীতির একমাত্র উদ্দেশ্য। সে কারণেই এ দুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গে পাঠকের যোগ্যতা বা অধ্যবসায়ের প্রশ্ন তোলা এতটা বিরক্তিকর আমার কাছে। কেউ যদি খবরের কাগজের crossword puzzle সমাধান করতে অধ্যবসায়ী না হন তার জন্য তাঁর অধ্যবসায় বা বুদ্ধি সম্পর্কে কোন প্রকার প্রশ্নই তোলা চলে না। বরং যে-লেখক 'সাহিত্য' কথার 'সহিত' মূলটা ভুলে গিয়ে পাঠকদের বুদ্ধিবত্তা পরীক্ষা করতে ধাঁধা রচনায় রত হন তাঁর দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কেই প্রশ্ন ওঠে।

এই ধাঁধার এফেক্ট কিভাবে ফোটানো হয়েছে? প্রথমত স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয় গোপন রাখা; স্বপ্ন, সত্য ও প্রলাপের মধ্যে সীমানা-চিহ্ন না রাখা। দ্বিতীয়ত, লেখার ভাষায় স্বপ্নের প্রলাপের এবং চেতনাপ্রবাহের বাঁধুনিহীনতা এবং বিচ্ছিন্নতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে আরোপ করা; তৃতীয়ত বাংলা ভাষা ব্যবহার না করে একটা code ভাষা ব্যবহার করা।

আমি যাকে code বলছি তাকে লেখকেরা বোধহয় প্রতীক বলবেন। প্রতীক এবং code-এর ব্যবহারের পিছনে ঠিক বিপরীত রকমের উদ্দেশ্য থাকে। লেখক প্রতীকের ব্যবহার করেন তাঁর বক্তব্যকে আরও সুপ্রকাশ করতে; code ভাষার সৃষ্টি হয় বক্তব্যকে লুকিয়ে রাখার জন্য। ভাল প্রতীকতা ব্যবহারের লক্ষণই এই যে প্রতীকটি ঠিক কিসের তা বুঝতে

অসুবিধে হয় না, কারণ প্রতীকের মধ্যে যে-ভাবটিকে ঘনীভূতভাবে প্রকাশিত করা হয় তা অপেক্ষাকৃত কম ঘনীভূত অবস্থায় প্রতীকের মাধ্যমে ছাড়াও প্রকাশ লাভ করে। সুতরাং কোন এক প্রতীকের সম্যক অর্থ বুঝতে না পারলেও প্রতীকী সাহিত্য দুর্বোধ্যতা প্রাপ্ত হয় না। লেখক যতটা বলতে চেয়েছেন ততটা পাঠকের কাছে পৌছয় না, কিন্তু যা পৌছয় তা অর্থহীন নয়। code-এর বেলা ব্যাপারটা একেবারে উল্টো। code-এর চাবি যদি জানা না থাকে তো কিছু অর্থই বোঝা যাবে না। (তা যদি যায় তো code-এর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়) Wild Duck নাটকের বুনো হাঁসটা প্রতীকার্থে ব্যবহৃত কিন্তু ঠিক কিসের প্রতীকতা তা করছে তা যে পাঠক না বুঝবে তার কাছে নাটকের তাৎপর্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট হবে না, কিন্তু তা বলে নাটকটা দুর্বোধ্যও ঠেকবে না। কিন্তু দীপেনবাবু যখন লেখেন "দেশটা তখন 'নৌকো' হয়ে মোহানায় যাবার উৎসবে মেতেছে", প্রদ্যোৎবাবু যখন লেখেন "অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যা দৈত্যপুরী থেকে" এবং সত্যবাবু যখন লেখেন "অন্ধকার সমুদ্র হয়ে গেছে," "মা সমুদ্র হয়ে গেছে," তখন "নৌকো" "মোহানা" "দৈত্যপুরী" "অন্ধকার" এবং "সমুদ্র" প্রতীকও নয়, সংকেতও নয়, এরা code।

শুধু যে তারা code ব্যবহার করেছেন তাই নয়। বলা চলে তাঁরা বাংলাভাষা বর্জন করে নিজের নিজের এক একটা code ভাষা তৈরি করে তাই ব্যবহার করেছেন। তার কারণ তাঁদের ভাষায় code-এর এতই প্রাচুর্য যে বাংলা আর বাংলা থাকে নি। ইংরেজ লেখক তাঁর বক্তব্যকে খোলসা করার জন্য স্থানবিশেষে ফরাসী শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু তাঁর লেখায় যদি অর্ধেক শব্দই ফরাসী হয়ে থাকে তো তারপরও নিশ্চয়ই তার ভাষাকে ইংরেজী বলা চলে না। সাধারণ ইংরেজ পাঠকের চোখে তা ইংরেজী ভাষার উপর অত্যাচার করাই হয়। এ ব্যাপারে অবশ্য প্রদ্যোৎবাবু যতটা শুদ্ধতা অর্জন করতে পারেন দীপেনবাবু এবং সত্যবাবু তা পারেন না। এঁদের দুজনের লেখার অংশবিশেষে ভাষা লজ্জাকর রকমের সহজবোধ্য বাংলা হয়ে ওঠে। প্রদ্যোৎবাবুর লেখার আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত কোথাও code-এর ব্যবহারে শৈথিল্য দেখা দেয় না।

Code-এর ব্যবহার ছাড়াও এ তিনজন লেখকের লেখা অনেক জায়গায় দুর্বোধ্য, অনেক জায়গায় দুর্বোধ্য না হয়েও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে তাঁদের

ভাষার উপর 'কাব্যিক' অত্যাচার করার প্রবণতার দরুন। শব্দকে আভিধানিক অর্থের থেকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করলেই যে ভাষা কবিত্বময় হয়ে ওঠে তা নিশ্চয় এক রবীন্দ্রনাথের 'সে' ছাড়া আর কেউ বলবে না। অলঙ্কারের ব্যবহার সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য, সৌন্দর্যের প্রকাশকে পূর্ণতর করে তোলার জন্য। একথা দেহের সম্বন্ধে যেমন সত্য, ভাষার সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই। দেহের অ-জায়গায় অশোভন অলঙ্কার ব্যবহারে দর্শককে চমক লাগান যায় সত্যি, কিন্তু সে চমক লাগানোটাকে একটা মূল্যহিসেবে গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া এমন অলঙ্কার ব্যবহারও কল্পনা করা যায় যাতে দেহের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়ে শুধু অলঙ্কারই দেখা যায়। সেক্ষেত্রে অলঙ্কারটা সুন্দর না অসুন্দর আলোচনা করা অবান্তর কারণ অলঙ্কার ব্যবহারটা যে অসুন্দর সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বোরখার উপরে জরির কাজ যত সুন্দরই হোক তাতে বোরখাধারীর সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয় একথা নিশ্চয়ই ঠিক নয়। অবশ্য, ভাষায় অলঙ্কারের ব্যবহারের উপযোগিতা রসবিচারের ব্যাপার, তার ভাল-মন্দ সম্পর্কে মত দেওয়া যায়, রায় দেওয়া যায় না। কিন্তু অলঙ্কারের আধিক্যে বক্তব্যই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কিনা তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

সত্যবাবু যখন লেখেন, "ভাতগুলো পাখা মেলত" বা "মা-মা-গন্ধ" তখন আমি যদি বলি এতে লেখার সৌন্দর্য বৃদ্ধি না পেয়ে তাতে কমিক এফেক্ট সৃষ্ট হয়, তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে; কিন্তু যদি বলি মা-মা-গন্ধ বাক্যব্যবহারে বা ভাতগুলোর সঙ্গে পাখাধারী জীবের তুলনা করে লেখক নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করতেই অক্ষম হয়েছেন তা নিয়ে তর্ক উঠবে কি? দীপেনবাবু যখন ফুলের অস্ফুট আর্তনাদের কথা, অলৌকিক যন্ত্রণার কথা বলেন, মরীচিকা জ্বালার কথা বলেন, আশ্চর্য চোখের কথা বলেন, তখন তিনি সুন্দর আওয়াজের আলপনা হয়তো কাটছেন কিন্তু "অলৌকিক" "আশ্চর্য" "মরীচিকা" ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যবহারে তিনি যা প্রকাশ করতে চাইছেন তা কি সত্যি বেশী সুপ্রকাশিত হচ্ছে? ভাষার ব্যাপারে আমি যতটা আপত্তি প্রকাশ করছি তার কি সত্যি কোন প্রয়োজন আছে? এ-প্রশ্ন যিনি করবেন তিনি ভাষার সঙ্গে ভাষাভাষীদের মনের চিন্তাপ্রণালীর সম্পর্কটাকে একেবারে লঘু করে দেখছেন। চিন্তায় স্বচ্ছতা, ঋজুতা, যুক্তিপূর্ণতাকে যদি মূল্য হিসেবে মানা যায় তো ভাষাকেও স্বচ্ছ ঝরঝরে এবং স্পষ্টভাবে অর্থবহ হতে হবে। ফরাসী চিন্তার যুক্তিপূর্ণতা এবং ফরাসী

গদ্যভঙ্গীর lucidity এ দুটো নিশ্চয়ই পরস্পরের সম্পর্কবিরহিত নয়। বাংলা সংস্কৃতিজগতে যে দার্শনিক বা intellectual বলে কিছু নেই তার সঙ্গে বাংলা গদ্যের lucidity-র অভাবের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আজকে যখন সর্বগ্রাসী শূন্যমূল্যতা বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে চিন্তার অলসতা, চিন্তার অসততা, যুক্তির উপর আস্থাহীনতা ইত্যাদি অবক্ষয়ী মনোভাবের প্রসার ঘটাচ্ছে তখন বাংলা গদ্যের ভাষাকে কাব্যময় করে তোলার নামে তাতে অস্পষ্টতা, বাঁধুনিহীনতা, ঋজুতার অভাব বাড়িয়ে তোলা অপরাধ বিশেষ। মার্কসবাদী সাহিত্যিকের পক্ষে এই অপরাধ একেবারেই অক্ষমণীয়। এ প্রসঙ্গে ভুলে না যাই, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গদ্যে কাব্যগুণের বাড়াবাড়ি তো এখনই যথেষ্ট রয়েছে, যার দায়িত্ব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই। বাংলা ভাষার উনবিংশশতকীয় ঋজুতা ও স্পষ্টতার জায়গায় ছন্দোময়তা ও পল্লববাহুল্য আমদানি হওয়ায় বাঙালীর মনীষার কত যে ক্ষতি হয়েছে তার একটা পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে intellectual লেখার প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে, অর্থাৎ প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের বাংলার intellectual tradition-এর ধারার সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়ার মধ্যে। এখন যা প্রয়োজন তা এই রাবীন্দ্রিক ধারার সম্পূর্ণ বিপরীতকরণ, যদি বাংলাভাষা ও বাংলা মনীষার পূর্ণতর ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলাই আমাদের কাম্য না হয়।

দুই

এবারে আমরা দেখব, "ছোটগল্প—নূতন রীতি" নামে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তার সঙ্গে কোন মার্কসবাদী সাহিত্যিক জড়িত থাকার পরও মার্কসবাদী আখ্যা পেতে পারেন কিনা। উত্তরটা যে 'না' তা সহজেই প্রতিষ্ঠিত করা করা যায়। কারণ এ-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও তার মূল দৃষ্টিভঙ্গি আন্দোলন-কারীদের লেখা পড়ে অনুমান করতে হয় না, আন্দোলনের মুখপাত্রেরা একাধিক প্রবন্ধে খোলসা করেই তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছেন। অতএব তাঁদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

শ্রীবিমল করের প্রবন্ধ, "ছোটগল্প: নূতন রীতি—প্রথম প্রস্তাব"-কেই আন্দোলনের সরকারী manifesto বলে মনে হয়। এই manifesto পড়ে যতটুকু বুঝতে পারলাম তা এই: ১। আন্দোলনকারী লেখকেরা "তাঁদের রুচি, ইচ্ছা এবং মর্জিতে বিশ্বাস রেখে লিখবেন,···তাতে যত অল্প পাঠকই

জুটুক যায় আসে না।" ২। ছোটগল্পের প্রচলিত কোন তত্ত্বে তাঁরা বিশ্বাস করেন না; ৩। ইউরোপীয় ছোটগল্পের ইতিহাসে দেখা যায় যে দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগে ছোটগল্পের আদর্শ নাটক থেকে বদলে হয়ে ওঠে কবিতা। "যান্ত্রিকতা থেকে তাকে মুক্ত এবং উন্নত করার প্রচেষ্টা"-য় "ছোটগল্পের সঙ্গে কবিতার বিবাহ দেবার" চেষ্টা দেখা দেয়। বহির্ঘটনার জায়গায় অন্তর্ঘটনা তাতে পায় প্রাধান্য। আরও পরে "মেটাফিজিক্যাল উপন্যাসের মতন এই সব গল্পও আসলে মেটাফিজিক্যাল" হয়ে ওঠে।

শ্রীবিমল কর আসল কথাটা আলোচনাই করেন না। কেন আজ, ১৯৬০ সালে, বাংলা সাহিত্যে তাঁরা এক বিশেষ নূতন রীতি প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হয়েছেন তার কোন ব্যাখ্যা নেই। কিছু একটা নূতন করতে চাইছেন, স্থূল জিনিস নিয়ে কারবার না করে সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে করতে চাইছেন, নূতন কথা বলার জন্য নূতন রীতি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চাইছেন, এ সবই আনন্দের কথা। কিন্তু যে বিশেষ রীতি তাঁরা প্রবর্তন করতে চান তার প্রকৃতি কি, কি তাঁদের নূতন কথা এবং সেই কথা বলার জন্য এই নূতন রীতিই কেন বিশেষভাবে উপযোগী তার আলোচনা কোথাও করেন না। তবে বোঝা যায়, বহির্ঘটনার চেয়ে অন্তর্ঘটনার উপরেই তাঁদের ঝোঁক বেশি, এবং এই অন্তর্ঘটনার প্রকাশে "বাঁধা পথে" এগিয়ে যাওয়া কঠিন, ফলে লেখককে "রূপক প্রতীক স্বপ্নসুলভ প্রতিচ্ছবি ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়।"

শ্রীবিমল করের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে মার্কসবাদী কেন বাধ্য এবার আমি সংক্ষিপ্তভাবে তা লিপিবদ্ধ করব।

১। Real is Rational—এ হেগেলীয় তত্ত্বে মার্কসবাদ বিশ্বাস করে না। যেহেতু ইউরোপীয় গল্পের ইতিহাসে একদা কিছু প্রবণতা এসেছিল (এবং আবার চলেও গেছে অনেকাংশে) সেহেতুই যে তারা সাহিত্যের প্রগতি সূচিত করে তা অবশ্যই মানা চলে না।

২। মার্কসবাদ দর্শন ও মেটাফিজিক্সে প্রভেদ করে। দর্শনে চিন্তার মুক্তি, মেটাফিজিক্সে চিন্তার বিনাশ। মেটাফিজিক্যাল ছোটগল্প বা অন্য কিছুকেই মার্কসবাদী প্রগতিশীল বলে মানতে পারে না।

৩। বহির্ঘটনার চেয়ে অন্তর্ঘটনা বেশি সত্য নয়। স্বপ্ন বাস্তবের অন্তর্গত বটে, কিন্তু জাগ্রত অবস্থার চেয়ে স্বপ্নদেখা দশা কিছু বেশি উন্নত বা সূক্ষ্ম নয়।

বাহিরকে স্থূল এবং অন্তরকে সূক্ষ্ম বলাটা ভ্রমমাত্র। বাহিরকে তুচ্ছ করে অন্তরকে সর্বস্ব করা বুর্জোয়া অবক্ষয়ী বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পলায়নপরতার একটা প্রকাশ মাত্র। একথা যদি ঠিক হয় যে বাংলা সাহিত্যে অন্তর্ঘটনার খুব বেশী স্থান এতদিন পর্যন্ত ছিল না, তার মানে এই নয় যে বহির্ঘটনাকে যত রকমভাবে বোঝা সম্ভব ততভাবেই বোঝা হয়ে গেছে। মানুষের মনের ভিতরের জটিলতার সামান্য অংশটুকুও যেমন এখনও বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাত হয়নি, তেমনি তাদের বহির্জীবনের জটিলতাও সব নিশ্চয় বিশ্লেষিত ও রূপায়িত হয়নি। মানুষ শুধুমাত্র একটি psychological being নয়, সে একটা সামাজিক জীবও বটে। জীবনের সমস্যার সব মূলই তার নিজের মনে (বিশেষ করে তার যৌনচেতনায়), এ-তত্ত্ব বুর্জোয়া মানসের পলায়নপরতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে এসেছে। মানুষকে অন্য মানুষের সঙ্গে সমাজবদ্ধ অবস্থায় দেখলেই সমাজের কাঠামো সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে পড়ে, তা যাতে না ওঠে তাই গত এক শতাব্দী যাবৎ বুর্জোয়া মানসের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। মানুষকে একক হিসেবে দেখা, এবং বাইরে না তাকিয়ে কেবলমাত্র ভিতরে তাকানো একই কারণে। মানবিক সমস্যাদির সমাধানে বুদ্ধির প্রয়োগ হয়ে 'যাতে সামাজিক কাঠামোতে টান না পড়ে তাই বুদ্ধি এবং যুক্তির অক্ষমতা প্রচার করা হয়ে এসেছে বুর্জোয়া সমাজের আত্মরক্ষার অপর এক অস্ত্র।

মার্কসবাদী অন্তরকে অস্বীকার করে না, যৌনতাকেও নয়, অবচেতন মনকেও নয়, কিন্তু তাদের কোনটিকেই সে মানবিক সত্তার প্রাথমিক ভিত্তির স্থান দেয় না। মার্কসবাদী সাহিত্য মানুষকে দেখে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ অবস্থায়, এবং দেখে তার বাহিরের সঙ্গে অন্তরের, চেতন মনের সঙ্গে অবচেতন মনের, যৌনতার সঙ্গে অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির পরস্পর নির্ভরতার মধ্যে।

৪। শুধুমাত্র ইচ্ছা রুচি ও মার্জিত বিশ্বাস করে যিনি লেখেন তিনি দায়িত্বশীল লেখক নন। মার্কসবাদী লেখক লিখবেন মানবিক সমস্যাদি সম্বন্ধে সচেতন থেকে, ইতিহাসবোধের ভিত্তিতে এবং সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কিত চিন্তা ও অনুশীলনজাত নিজের conviction-এ আস্থা রেখে। তাছাড়া মার্কসবাদী লেখক "যত অল্প পাঠকই জুটুক যায় আসে না," এ দম্ভোক্তিতে সায় দিতে পারেন না। তিনি পাঠকের রুচির দ্বারাই সম্পূর্ণ

ভাবে চালিত হবেন তা নয়, কিন্তু পাঠককে ভুলে যেতেও পারেন না। তাঁকে পাঠকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তার রুচি তার চাহিদা প্রভৃতিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। চেষ্টা করতে হবে নিজের সাহিত্যাদর্শকে বিসর্জন না দিয়েও, সাহিত্যের মানকে নিচে না নামিয়েও পাঠক সাধারণের আরও কাছে এগিয়ে যেতে। এ চেষ্টায় সাফল্যের সম্ভাবনাও আছে, যদি জয়েস্ এবং কাফ্‌কাকে আদর্শ না করে চ্যাপলিন এবং ব্রেখ্‌ট-এর শিল্পাদর্শকে চোখের সামনে রাখা যায়। এ প্রসঙ্গে সবিনয়ে প্রশ্ন করব, বাংলার শ্রেষ্ঠ জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যেও এমন কজন আছেন যাঁদের বিদ্যা মনীষা বা অভিজ্ঞতা তাঁদের পাঠকদের বোধের অগম্য হতে পারে?

শ্রীবিমল কর ছাড়া অন্যান্য তরুণতর যে কয়জন লেখক "ছোটগল্পে নূতন রীতির" সমর্থনে প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁদের লেখাগুলো পড়ে বড় আনন্দ পাওয়া যায়। আর কিছু না থাক সতেজ ভাব তো আছে। আর তারুণ্যের দম্ভ এবং আত্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে না কে? তবে কিনা যে তরুণ লেখকেরা অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত লেখকদের এবং বাঙালী পাঠক সাধারণের স্থূল বুদ্ধির প্রতি এতই অবজ্ঞা পোষণ করেন, যাঁরা নিজেদের "মূলতঃ শিক্ষক" বলে মনে করেন, তাঁরা যে জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় দেন তাঁদের প্রবন্ধে তাতে তো আমাদের স্থূল মস্তিষ্কে বিশেষ আশ্বাস সঞ্চার করে না। তাঁদের মূল্যবুদ্ধি এবং তাঁদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বলতম উদাহরণ হিসেবে গোটাকয়েক মণিমুক্তা আপনাদের সামনে রাখছি। আশা করি কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

১। "আসলে যুক্তি কথাটাই যুক্তিবিরোধী···কথাসাহিত্যে আভিধানিক অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া ভালো।"

২। "এ গল্পের পটভূমি হিসেবে যে-সব ঘটনা বা চরিত্রের উল্লেখ আছে, সে-সব বাস্তব পৃথিবীতে কোথাও আছে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর।"

৩। "কিন্তু সমস্যা তাদের নিয়ে, ইংরেজিতে যার প্রতিশব্দ Mass···"

৪। "সাহিত্যে অভিধানের অধিকার অসম্ভব।"

৫। "তরুণ গল্পকার তথাকথিত জনপ্রিয় সাহিত্যিকের মত entertainer নন, তিনি মূলতঃ শিক্ষক।"

কি ধরনের শিক্ষা আমরা এই তরুণ গল্পকারদের কাছ থেকে পেতে পারি তার একটু নমুনা এবার দেওয়া যাক "ছোটগল্প—নূতন রীতি" কাগজের প্রথম

সংখ্যায় প্রকাশিত অনতিতরুণ শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পটি থেকে। গল্পটিতে মূলতঃ তিনটি উপাদান আছে। ১। এক বিবাহিত পুরুষ অবোধ্য কারণে তার স্ত্রীর সম্পর্কে যৌন বিতৃষ্ণা অনুভব করে। ২। মনে মনে সে অন্যান্য স্ত্রীর সঙ্গে promiscuous আনন্দ কামনা করে। ৩। কিন্তু নিজের স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে তার মন ঈর্ষাকাতর।

এর মধ্যে কোন নতুন তত্ত্ব আছে কি? এমন কিছু আছে যার জ্ঞান কলকাতার যে-কোন রকের আলোচনায় পাওয়া যায় না? স্বপ্নে যে প্রচ্ছন্ন যৌনতার স্বরূপ অপ্রচ্ছন্ন হয়ে ওঠে তা আগে জানতেন না? আপনি না জানলেও এ তত্ত্ব কি ফ্রয়েডীয় প্রভাবযুক্ত ইউরোপীয় সাহিত্যে আলোচিত হয়ে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি? তথাপি নতুন রীতির নাম করে গল্পটির আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত একটা স্বপ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নায়কের যৌন-লোলুপতাকে যে বেশ সুদক্ষভাবেই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, তা অস্বীকার করব না। নারীর শরীরকে যৌনক্ষুধাকাতর পুরুষ কিভাবে দেখে তার প্রকাশ যে বাংলা ভাষায় এত ভাল করে করা যেতে পারে তা জানতাম না। "···জ্যোৎস্নার রেখার মতো চিকন পাতলা নরম নরম শরীর। এখানে তেমন মোটা মেয়ে থাকবে না, কুমারীরা সাধারণতঃ থাকে না······মসৃণ গলা, সরু কোমর, কারোর বুক একটু বেশী ছড়ানো, কারোর অতিরিক্ত আঁটো সাটো।······"

স্বপ্নে সাঁতারের নীল পোশাক-পরিহিত দুটি সুন্দরী তরুণী এসে নায়কের সামনে তাদের কাঁচা ফলের সঙ্গে উপমা দেওয়া যায় এমন কুমারী স্তন অনাবৃত করে, তার মাথার দুদিকে তাদের সোনার থামের মতো উরু রাখে। অন্য এক বন্ধু বর্ণনা করে কি করে "স্টার্ক নেকেড—সম্পূর্ণ উলঙ্গ" একটি মেয়ে এসে প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে একটা কিস্ দিয়ে কচ্ছপের মতো মুখে কামড় দিয়ে বসে এবং আরও অনেক কিছু করে।

এ ধরনের স্বপ্ন পুরুষ মানুষ দেখে বৈকি, এবং স্বপ্ন যখন বাস্তবের অংশভূত তখন সাহিত্যেও তার স্থান হতে পারে বৈকি। কিন্তু কোন দৃষ্টিভঙ্গিহীন একটা যৌনস্বপ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে সূক্ষ্মবুদ্ধিটাই বা কোথায়, স্থূলবুদ্ধি বাঙালীর শিক্ষণীয়ই বা কি আছে বোঝা গেল না। যৌনতা তো আজ সাহিত্যে কিছু নতুন জিনিস নয়। কিন্তু লরেন্সের সাহিত্যে, হাক্সলির সাহিত্যে, জিদের সাহিত্যে লেখকদের যৌনতা সম্বন্ধে বলবার কথা কিছু আছে।

তাদের গল্পে-উপন্যাসে গতি আছে। গতি সামনের দিকে হয়তো সব সময় নয়, তা হয়তো পিছনের দিকে অথবা তা হয়তো চক্রগতি মাত্র। তবু গতি আছে। আজকের জীবনে যৌনতার যে স্থান তাছাড়া অন্য কোন স্থান তার হওয়া উচিত এই বিশ্বাস তাঁদের লেখায় যৌনপ্রসঙ্গ অবতারণা করিয়েছে। একস্থান ছেড়ে অন্যস্থানে যাওয়ার ধারণার মধ্যেই রয়েছে গতি। তা সব সময়ে প্রগতি না হলেও, তাঁদের সাহিত্য সব সময়ে প্রগতি-সাহিত্য না হলেও তা অন্ততঃ উদ্দেশ্যপূর্ণ সাহিত্য। লরেন্স, হাক্সলি, জিদ—আমাদের অনেক ভাবিয়েছেন। শিখেওছি অনেক কিছু তাঁদের থেকে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর "দুঃস্বপ্ন" সম্পূর্ণই উদ্দেশ্যহীন, সম্পূর্ণই নীতিহীন। এ গল্পই যদি এ আন্দোলনের প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে থাকে তো আন্দোলনটির প্রসার বাংলা-সংস্কৃতির দুঃস্বপ্নেরই কারণ হবে বটে।

অশোক রুদ্র

সাংস্কৃতি-সংবাদ

সভ্যতার প্রহরী ও কারাগার

মেক্সিকোর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী এবং সম্ভবত বিশ্বের সর্বোত্তম ফ্রেস্কো পেইণ্টার আলফারো সেকেরাস্ গত আগস্ট মাসে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ খুব 'মারাত্মক'। রেল-কর্মচারী ও শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের নেতৃবৃন্দ এক বছর যাবৎ বিনা বিচারে বন্দী আছেন। তাঁদের মুক্তির দাবীতে যে শোভাযাত্রা পরিচালিত হয়, তিনি তার পুরোভাগে ছিলেন।

চৌষট্টি বছরের এই প্রবীণ শিল্পী সম্ভবত তাঁর জীবনের মহত্তম শিল্পকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি চাপুলতেপেক্ ক্যাসাল-এ মেক্সিকোর বিপ্লবকে চিত্রিত করছিলেন। সেকেরাসের হাতের তুলি কেড়ে নিয়ে পাশব-শক্তি তাঁকে কারাগারে ছুঁড়ে দিয়েছে।

অবশ্য মেক্সিকোর পাবলিক প্রসিকিউটার স্বীকার করেছেন যাঁদের মুক্তির দাবীতে শোভাযাত্রা পরিচালিত হয়েছিল, তাঁদের গ্রেপ্তার ও আটক রেখে সরকার নিজেই আইন ভঙ্গ করেছেন।

সেকেরাস্ জন্মেছেন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯১১ থেকেই দেশের শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর সক্রিয়, নেতৃস্থানীয় ভূমিকা। এর তাৎপর্য আমাদের দেশের 'বিশুদ্ধ শিল্পবাদী'দের বোঝা দরকার। তিনি একই আবেগে মেক্সিকোর খনি শ্রমিক ও শিল্পীদের ইউনিয়ন গঠন করেন। কোনোটির গুরুত্বই তাঁর কাছে কম নয়। আবার শিল্পের দাবীও মেটান। সময়, সমাজ ও জীবনের প্রতি তাঁর এই দায়িত্ববোধই সেকেরাস্‌কে শিল্প সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই তাঁর মধ্যে আমরা জীবন ও শিল্পের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন দেখতে পাই। তাই এতবড় একজন শিল্পীর পক্ষেই মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি হওয়া সম্ভব হয়।

স্বয়ং পিকাসো এবং অগণ্য ফরাসী লেখক-শিল্পী মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্টের কাছে সেকেরাসের মুক্তির জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ভিয়েনায় ইউনেস্কো

আয়োজিত ও সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিল্পী সম্মেলনে যোগদানকারী এক বিরাট সংখ্যক শিল্পী, ভাস্কর, কলাসমালোচক এই আবেদনপত্রকে সমর্থন জানিয়েছেন।

এতদ্দেশীয় 'সংস্কৃতির মুক্তি যোদ্ধারা' সেকেরাস্ সম্পর্কে যথারীতি উদাসীন। কারণ পিকাসো সেকেরাস্‌কে মহৎ শিল্পী বলে মনে করলেও এই প্রবীণ, মনস্বী, চিন্তাবীররা কেন সেকেরাস্‌কে ধর্তব্যের মধ্যে আনবেন? একই বছরে বোদ্‌লের ও ডস্টয়েভ্‌স্কি জন্মেছিলেন, গ্রীষ্মকালে পাৎলুনের মধ্য দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ে প্রভৃতি বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কারে তাঁদের প্রায়ই ব্যস্ত থাকতে হয়। তাছাড়া সেই কবে হাঙ্গেরিতে কি ঘটেছিল, তার দুঃস্বপ্নে আজও এঁদের অনেকেই স্লিপ ওয়াকার। তার ওপর স্কলারশিপ, বক্তৃতাভ্রমণ প্রভৃতি তাবৎ সংস্কৃতিমূলক দায়িত্ব পালনের আয়োজনেও এঁদের হামেশা ব্যস্ত থাকতে হয়। সর্বোপরি স্পেণ্ডার ও নানা মুরুব্বী আসেন—সময় কই?

তাই সেকেরাস্ সম্পর্কে এঁরা নীরব। সেকেরাস্ যে তাঁর অসমাপ্ত শিল্পকর্ম শেষ করতে পারলেন না, সেকেরাস্ যে আজও কারাগারে, সেকেরাস্ যে একজন মানুষ—যিনি পৃথিবীকে ভালবেসেছেন, এ সবই তাঁদের কাছে 'মায়া'। তাই স্টেট্‌স্‌ম্যানে কোন চিঠি বেরোয়নি বা কবিতালোচনা প্রসঙ্গে কোনো মর্মঘাতী গদ্যাংশ।

অথচ কি করে ভুলি মাত্র চার বছর আগে ভারতসরকারের আমন্ত্রণে সেকেরাস্ কলকাতা এসেছিলেন এবং আকাদেমি সার্লতে রঙিন স্লাইডে নিজের শিল্পকৃতির পরিচয়দান প্রসঙ্গে জীবন ও শিল্প বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করে গেছেন? কি করে ভুলি 'বুর্জোয়াবাদের প্রতিকৃতি', 'আক্রমণকারী ধ্বংস হোক' ও 'ক্যুবার বর্ণসাম্যের উদ্দেশে রূপক'—এই চিত্রমালায় তাঁর অসাধারণ শিল্প ক্ষমতার সামান্য নিদর্শন দেখে দর্শককূল স্তম্ভিত হয়েছিলেন। কি করে ভুলি যে সেকেরাস্ আমাদের অপরিচিত নন!

কলম্বিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, মিশর প্রভৃতি দেশে যে সমস্ত লেখক-শিল্পী সরকারী স্বৈরাচারের ভ্রূকুটিতে কারারুদ্ধ—কি করে তাঁদের কথা ভুলব? পর্তুগালের বন্দী লেখকদের মধ্যে যে একাধিক ব্যক্তির নাম নোবেল কমিটিতে আলোচিত হয়েছিল—কি করে তা বিস্মৃত হব? মিশরের জাতীয় আন্দোলন, বিশেষত নারী আন্দোলনের নেত্রী, সুলেখিকা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্না শিল্পী ইম্‌জি এফ্‌লাতুন কারাগারে রঙ ও তুলির অভাবে ছটফট করছেন—এ কথাই বা ভুলব কোন্ উপায়ে? মিশরে শান্তি সংগ্রাম

কমিটির প্রবর্তক ইম্‌জি চেয়েছিলেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি। কারাভ্যন্তরে বসে হয়তো তাঁর চোখে আজও সেই অনির্বাণ স্বপ্ন।

আমাদের সেই সব বেতনভোগী 'সংস্কৃতির মুক্তিযোদ্ধাদের' কথা ধরি না। শীত জমে উঠেছে। কলকাতায় বড়দিনের উৎসব। নানাবিধ দায়িত্ব পালনে তাঁরা ব্যস্ত থাকুন এবং মাঝে মধ্যে পত্র-পত্রিকায় আশ্চর্য তত্ত্ব আর তথ্য হাজির করে ক্লাউনের ভূমিকায় আমাদের প্রচুর হাসান। কিন্তু বাংলাদেশের সৎ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণ ও সংস্কৃতিকর্মী সেকেরাস্, ইম্‌জি এবং ধনতান্ত্রিক জগতের কারগারে বন্দী কোনো লেখক শিল্পীকে ভোলে নি, ভুলবে না।

এ্যাংগ্রি ওল্ডম্যান

প্যাট্রিস লুমুম্বার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলকাতার মানুষ যখন ময়দানে এক বিক্ষোভ সভায় মিলিত হয়েছে, ঠিক তখন ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ. হলে স্টিফেন স্পেণ্ডার বিশুদ্ধ শিল্পের আবেগে বক্তৃতারত ছিলেন। স্পেণ্ডার ও তাঁর হঠযোগী সম্প্রদায় সেই বিশ্ববিখ্যাত তিনটি বাঁদরের মতো কখনো কানে শোনেন না, কখনো চোখে দেখেন না, কখনো বা কথা বলেন না। সুতরাং আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি, সেই সন্ধ্যায়ও ময়দানের জন-তরঙ্গধ্বনি তাঁর কানে প্রবেশ করে নি।

স্পেণ্ডার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবর্ধনা সভায় ইংলণ্ডের বর্তমান 'এ্যাংগ্রি ইয়ংম্যানদের' সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যৌবনকালে স্পেনের গৃহযুদ্ধ তাঁদের মনে উদ্দীপনা এনেছিল, জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছিল। বর্তমান যুবকরা মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্যবিহীন, কারণ তাঁদের সামনে কোনো বড় ঘটনা নেই। তাই মহৎ সৃষ্টিও সম্ভব না।

স্পেণ্ডারের এই দরিদ্র ব্রাহ্মণসুলভ উক্তি আমাদের বড়ই প্রীত করেছে। কোনো এক কালে ঘি খাওয়ার গন্ধ যে এতদিন পরেও হাতে লেগে থাকে, তা কি আমরাই জানতাম? বুঝতে হবে স্পেনের গৃহযুদ্ধের ঘিটুকু বড়ই নির্ভেজাল ছিল। তাই তারপর এত ঘটনা সত্ত্বেও স্পেণ্ডারের নাক থেকে সে গন্ধ গেল না। স্পেণ্ডার যদি জানতেন আমাদের দেশে পুরনো ঘি ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের রেওয়াজ আছে, তাহলে নিজের যাবতীয় ব্যাধি

আরোগ্যের জন্য আর একবার তিনি কঙ্গোর আন্তর্জাতিক বাহিনীতে নাম লেখাতেন কিনা জানতে ইচ্ছে হয়।

অবশ্য, কঙ্গোর বর্তমান অবস্থা বা ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার নানা অংশে যে অশান্তি, অস্থিরতা—তাকে আমলে আনা স্পেণ্ডারের মতো তুরীয়মার্গের সাধকের পক্ষে সত্যিই সহজ নয়। অথচ হাঙ্গেরি বা অন্য কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে নিত্য-নতুন 'রূপকথার অবস্থা' সৃষ্টি না হওয়ার ফলে স্পেণ্ডার বর্তমান যুবকদের সামনে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা উপস্থিত করতে পারছেন না। ফলে তাদের উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধবিহীন জীবন যাপন করতে হচ্ছে। তাই মহৎ সৃষ্টিও হচ্ছে না। হায়! সংস্কৃতির কি দুর্দিন! তাই না স্পেণ্ডারকেও বেকারত্ব ঘোচাবার জন্য শেষ-মেশ টলস্টয়ের মতো এক দীন ব্যক্তির পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লীর ভাঙা দরবারে নতুন করে আসন পাতার চেষ্টায় ছুটে আসতে হল!

শুধু একটি প্রশ্ন সব শেষে থেকে যায়। ইংলণ্ডের যুবকদের উদ্দেশ্যহীন, মূল্যবোধ-ভ্রষ্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষে তিনি কি ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয়ী চিত্রটিই আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন না? ফলে, তাঁর ভূমিকাটি কি আরো করুণ, আরো হাস্যকর হয়ে উঠল না?

ষ্টিফেন স্পেণ্ডার নামধেয় একদা সাহিত্যিক অধুনা বহুরূপী এই ক্রুদ্ধ প্রৌঢ় ব্যক্তিটির জন্য তাই আমরা সহানুভূতি বোধ না করে পারি না। কারণ বিবেকের লাঞ্ছনা আমাদের সর্বদাই ব্যথিত করে।

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ

বৃটিশ ফিল্ম ইনস্‌টিটিউটের ডিরেক্টর জেম্‌স্ কুইন্ কলকাতায় এসেছিলেন। ফিল্ম সোসাইটি ও ফিল্ম ডিভিসনের উদ্যোগে ক্যাথিড্রাল রোডে আকাদেমি ভবনের একটি অনুষ্ঠানে (১৭ই ডিসেম্বর) তিনি বৃটিশ ফিল্মের কিছু কিছু অসামান্য অংশ প্রদর্শনকালে চলচ্চিত্রবিষয়ক আলোচনায় নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। মিস্টার কুইনকে ফিল্ম সোসাইটি প্রযোজিত ও চিদানন্দ দাশগুপ্ত পরিচালিত পোর্ট্রেট অফ এ সিটি এবং সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটকের ('অযান্ত্রিক') চলচ্চিত্রের নির্বাচিত অংশ দেখান হলে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রের উচ্চ মান সম্পর্কে নিজের পরিপূর্ণ আস্থা ঘোষণা করেন।

ফিল্ম সোসাইটি ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র আন্দোলনে অত্যন্ত ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। সে কারণেই তাঁদের কাছে একটি বিনীত নিবেদন পেশ করার ভরসা রাখি। কলকাতা শহরের বহু বিচিত্র রূপ ও তার অনির্বাণ আত্মাটি পোর্ট্রেট অফ এ সিটিতে আসে নি। চিদানন্দ দাশগুপ্ত চলচ্চিত্র শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তিনি নিজেই এ অপূর্ণতা সম্পর্কে সব থেকে ভালো বুঝবেন। সুতরাং ভবিষ্যতে বিদেশী অতিথিদের কাছে প্রদর্শন করার আগে এই ছবিটি সম্পর্কে নতুন কিছু করা যায় কি না, আশা করি তা তিনি ও প্রযোজক গোষ্ঠী একবার ভেবে দেখবেন।

প্রসঙ্গত ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের কার্যকলাপ সম্পর্কে চলচ্চিত্রানুরাগী জনসাধারণ ও ফিল্ম সোসাইটির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলকাতার পথ-ঘাট যখন অশ্লীল সিনেমা পোস্টারে কলঙ্কিত, চলচ্চিত্র পত্রিকাগুলি যখন ক্রমশ পঞ্জিকাকেও লজ্জা দিচ্ছে, বম্বে মার্কা সিনেমাগুলি যখন আমাদের সামাজিক জীবনে গভীর সংকটের কারণ সৃষ্টি করে চলেছে—তখন এঁদের 'শুচিতাবোধে' আমরা 'হিরোশিমা মনামুর' বা 'ফেলিক্স ক্রুল' দেখতে পাই না। অথচ শুনেছি 'হিরোসিমা মনামুর' দেখা নাকি এক অভিজ্ঞতা।

বিদেশে সেন্সারবোর্ডের এই অশিক্ষা ও রুচিহীনতার বিরুদ্ধতা করার জন্য অজস্র ফিল্মক্লাব গড়ে উঠেছে। ফিল্মসোসাইটি এ জাতীয় ছবির অধিক প্রদর্শন এবং সেন্সারবোর্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করে কি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন?

ক্যাথিড্রাল রোডের আকাদেমি ভবনে সরকারী ফিল্মস ডিভিসন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে তথ্যচিত্র প্রদর্শন করছেন। যে বিপুল আগ্রহে দেশবাসী এই উদ্যোগে সাড়া দিয়েছেন, তাতে নিঃসন্দেহে বোঝা গেল আমরা সত্যই চলচ্চিত্রানুরাগী হয়ে উঠছি। এবং হাল্কা গল্পের আকর্ষণেই জনসাধারণ ছবি দেখেন না।

বাংলা দেশের সেই সমস্ত 'সফল' ও 'বিখ্যাত' চলচ্চিত্র-পরিচালকরা কি এ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করবেন?

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে কলকাতায় পাশাপাশি 'গঙ্গা' এবং 'নতুন ফসল' প্রদর্শিত হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে আজও একদা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ 'শুন বরনারী'র গল্প লেখেন এবং তা পর্দায় দেখানো হয়।

তবে, কে না জানে—এ সবই বিকার এবং বিকার চিরস্থায়ী হয় না।

কলকাতা আজ 'গানে পাওয়া শহর'। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সম্মেলন, জলসা ও নানা ধরণের অনুষ্ঠানে কলকাতা শহর নিজের সঙ্গীত সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত করেছে।

ঠিক এই সময়ে 'ধ্রুপদ প্রচারণী সভা'র জন্ম সত্যই এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এহেন প্রসার ও জনপ্রিয়তার কালে ধ্রুপদ চর্চা ক্রমশ কেন কমে আসছে তা ভাবা দরকার।

শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ সান্যালের উদ্যোগে আহৃত একটি ঘরোয়া বৈঠকে সভাপতি সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ সান্যাল, তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ সঙ্গীতবিদ নানা আলোচনায় সমস্যার চরিত্র বিশ্লেষণ ও সমাধানের পথ অন্বেষণের চেষ্টা করেন।

আমরা এই সভার কর্মপ্রয়াসের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছি এবং নিছক জনপ্রিয়তার মোহে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় সে দিকে শিল্পী ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়